গ ল্প লো ক

সুবোধ ঘোষ

গল্পলোক

কলকাতা • নিউ স্ক্রিপ্ট • ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

সূ চী প ত্র

‘গল্পলোক’

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

যুদ্ধের কয়েক বছর আগেকার কথা মনে পড়ে। প্রায় সবারই মনের চারপাশে সমাজবাদী সাংঘাতিক ভাবের একটা আবহাওয়া তৈরী। বাস্তবে তার দু'-চারটে নিস্তেজ স্ফূরণ চলেছে। মনের এই আবহাওয়া নিয়ে বোঝা যাচ্ছিল, সাহিত্য তার ক্লান্তিকর পথ থেকে আজও মোড় নিল না। বাঙালীর অসমাপ্ত জীবনের ছায়ায় রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্টমাষ্টার'-গল্প যে অসমাপ্তির আনন্দ দিচ্ছিল—গল্পের রস-পিপাসুরা তাতেই মোহিত ছিলেন।

এম্নি সময়ে শ্রী সুবোধ ঘোষের গল্প 'ফসিল' সেই আবহাওয়ায় যেন একটা মেঘ-নির্ঘোষ, যা শুনে কালকের তৈরী গল্প-সাহিত্যকেও আজ মনে হল ফসিল। আমরা দেখলাম, সাংঘাতিক ভাব যেন চূড়ান্ত রসমূর্তি পেয়েছে বস্তুর নাটকীয় সংঘাতে। ছোটগল্পে যেন অনেক দিন পরে আবার একটা সমাপ্তির সুর বেজে উঠল, যাকে সোমারসেট মম বলেন 'ফুলস্টপ'।

শ্রেণীদ্বন্দ্বে যে সামাজিক নাটক অনুষ্ঠিত হতে পারে তা যেন আমরা হৃদয়ে অনুভব করলাম সুবোধবাবুর 'গোত্রান্তর'-গল্পে।

'গল্পলোকে'র 'নির্বন্ধ'-গল্পে মধ্যবিত্তের সামাজিক নিয়তি আরো স্পষ্ট হয়েছে সন্দেহ নেই, যেহেতু এখানে তিনি অনেক বেশি বাস্তবমুখী।

অন্যত্র তিনি কল্পনার একটা ভাবলোককে বাস্তবে অবতীর্ণ করিয়েছেন। অবশ্য সে-কল্পনা মানব-বৃত্ত ছেড়ে কখনো শূন্যাকাশে উড্ডীন নয়। মানবহৃদয়ের সঙ্গে তার বসবাস, অথবা অন্তর্জীবনের সঙ্গে। যেমন তাঁর 'পরশুরামের কুঠার' বা 'অমিয় গরল ভেল'। 'কাবলীওয়ালা' আমাদের হৃদয়ের যে-স্থানকে স্পর্শ করে, 'পরশুরামের কুঠার' সে-স্থানকেই হঠাৎ সচকিত করে তোলে। হঠাৎ জাগরিত হই আমরা 'অমিয় গরল ভেল'র নায়িকার অন্তর্জীবনের ট্রাজিডিতে। এমন ট্রাজিডিই স্বচ্ছতর 'গল্পলোকে'র 'একতীর্থা'-গল্পে।

ভাবের জীবনাভিসার গল্প-শিল্পী শ্রী সুবোধ ঘোষকে মুগ্ধ করেছে। জীবন-কামনার কাছে যে নৈতিকতাও মূল্যহীন হয়ে পড়ে, এই দর্শন—মনস্তত্ত্ব নয়—তাঁর গল্প-গঠনের পেছনে সজাগ। তাই তিনি লক্ষ্য করেন, জীবন কোথায় জৈব-বৃত্তির বশে এসে জীবনের স্থিত মূল্যের সঙ্গে বিয়োগান্ত পালা অভিনয় করছে। এই বাস্তবতাকেই তাঁর 'গল্পলোকে'র 'কতটুকু ক্ষতি'-গল্পের শিল্পী-চরিত্র শ্রীমন্ত অভিনন্দন জানায়। এ-অভিনন্দন সুবোধবাবুর শিল্পী-সত্তার। তেম্নি 'শিবালয়'-গল্পে আমরা দেখতে পাব ধর্মাদর্শ রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শে এবং সামাজিক আদর্শে এসে মুক্তিস্নান করল।

'গল্পলোকে'র গল্পগুলোর বা গল্প-শিল্পী শ্রী সুবোধ ঘোষের সমালোচনা করবার যোগ্যতা আমার নেই, শুধু এ-কথাই বলতে পারি, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতায় যখন ক্লান্তি বোধ করেছি তখন তাঁর গল্পের জীবন-সংঘাত আমাকে মুগ্ধ করেছে। বাঙালী-জীবনের জল-রং ছবি নয় বলে যে-রস-পিপাসুরা সেদিন তাঁর গল্পে পূর্ণ তৃপ্তি পান নি,

তাঁদের রস-পিপাসায় কতোটুকু জল সুবোধবাবু দিতে পেরেছেন তা আমি জানি নে, আমি অনাবিষ্কৃতের আলো-ছায়া দেখেই তৃপ্ত হতে পেরেছি। তা-ই আমি জানাতে পারি, তার বেশি আর কিছু নয়।

আজকের পাঠক গল্প-শিল্পী শ্রী সুবোধ ঘোষে কবি ও নাট্যকারের সমাবেশ কতোটুকু লক্ষ্য করবেন, তা আমি জানি নে। কিন্তু এটুকু জানি যে, এ-লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হলে তাঁরা লেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হতে পারবেন না। তাঁর কবি-স্বভাব যে ভাষাকেই স্মরণীয় করেছে তা নয়, ভাব-দৃষ্টিতে একটি ঘটনাকে অবলোকন করবারও শক্তি দিয়েছে। আর গল্প-শরীরের ঔৎকর্ষ দান করেছে তাঁর নাট্য-প্রতিভা।

গল্পলোক | তিন অধ্যায়

তিন অধ্যায়

অহিভূষণ হঠাৎ এসে বললো—'ভাই ভবানী, একটা কন্‌-ফিডেন্সিয়াল টক ছিল তোর সঙ্গে।'

আড্ডার মাঝখানে বসেছিলাম। বারীন তখন বলছিল—'কি আশ্চর্য, মেয়েটাকে মুহূর্তের জন্যও হাসতে দেখলাম না। লোকের দিকে একটু চোখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নেই! এই ধরণের মেয়েদের মতিগতি যদি একটু অ্যানালিসিস ক'রে দেখ, তাহলে বুঝতে পারবে যে, তারা শুধু চায়…'

পুলিন বাঁড়ুয্যের মেয়ে বন্দনার কথা বলছিল বারীন। এই রকম একটা সুপ্রাসঙ্গিক অবস্থায় এসে অহিভূষণ বাধা দিল। আরও বেশী অপ্রসন্ন হয়ে উঠলাম, অহিভূষণ যখন বললো—'এখানে বলতে পারবো না ভাই, একটু ডিসট্যান্সে যেতে হবে।'

এই রকম বিশ্রী ভাবেই অযথা ইংরেজী বলে অহিভূষণ। ইদানীং আরও বেশী ক'রে বলে। অবশ্য আমরা জানি, অহিভূষণের লেখাপড়া ফোর্থ ক্লাসের চৌকাঠ পার হয় নি। সেই যে আট বছর আগে আমরা অকৃতী অহিকে একা ফোর্থ ক্লাসে রেখে সদলে থার্ডে চলে গেলাম, তারপর থেকে জীবনে সত্যিই ক্লাস হিসেবে ওর সঙ্গে এক হতে পারলাম না। অহি আজও যে আমাদের ক্লাবে ও আড্ডায় আসে সেটা তার নিজেরই আগ্রহ। আমরা ওকে কখনো চাই নি। চলে যেতেও অবশ্য স্পষ্ট করে কখনো বলি না। কিন্তু আমাদের আচরণে সেটা ওর বোঝা উচিত ছিল। অহি যেন আমাদের তাচ্ছিল্যগুলিকে একেবারেই গায়ে মাখে না। সব জেনে শুনেই সে

আমাদের সঙ্গে মেশে। তার প্রতি আমাদের একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য অনাগ্রহ ও করুণাকে সে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। অহি যেন আজও আমাদের ক্লাসটা ছাড়তে চায় না। শেষ বেঞ্চের এক কোণে, একটু পৃথক হয়ে, সবার পেছনে বসে থাকবে, তবু আমাদেরই সঙ্গে।

বলতে ভুলে গেছি, বারীনও সেই ফোর্থ ক্লাসেই ফেল করেছিল। আর পড়া শুনা না ক'রে স্কুল ছেড়ে দিল। কিন্তু আজ আট বছর পরেও বারীন আর আমরা যেন এক ক্লাসেই আছি। বারীন কণ্ট্রাকটারী করে, এরই মধ্যে বেশ কিছু, যাকে বলে, বেশ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে বারীন। কিন্তু অহি? অহি ঠিক তার উল্টো। অহির কথা একেবারে স্বতন্ত্র। বড় সাংঘাতিকভাবে ফেল করেছে অহি। বাইশ টাকা মাইনের একটি চাকরী করে। দুঃখটা আসলে ঐ বাইশ টাকায় বাঁধা দীনতার জন্য নয়। আসল কথা হলো চাকরীটাই। বড় নীচ নোংরা নগণ্য চাকরী। কখনো কোনো ভদ্রলোকের ছেলেকে এ-রকম চাকরী করতে আমরা দেখি নি, শুনি নি।

খুব ভোরে ঘুম ছেড়ে বাইরে বেড়ানো যাদের অভ্যাস, তারাই শুধু অহিভূষণের চাকরীর স্বরূপ জানে, কারণ তারাই ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখতে পায়। এক হাতে প্রকাণ্ড একটা খাতা, আর এক হাতে একটা লক্কড় সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে সহরের যত লেন আর বাই-লেনের মোড়ে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে অহিভূষণ। ভোরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে সরু গলির মুখ থেকে এক এক ক'রে চার পাঁচটী অদ্ভুত ধরণের মুর্তি এসে অহির কাছে দাঁড়ায়। খাতাটা খুলে অহি তাদের হাজিরা লেখে। নীচু স্বরে কয়েকটা কথা বলে অহি, কখনো বা বিরক্ত হয়ে ধমক দেয়। তারপরেই অহিভূষণের লক্কড় সাইকেল আবার আর্তনাদ ক'রে ওঠে। আর একটা গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়ায় অহিভূষণ চাটুয্যে!

আমাদের এই ছোট সহরের ছোট মিউনিসিপ্যালিটির একজন কর্মচারী হলো আমাদের পরিচিত ও প্রাক্তন সহপাঠী অহিভূষণ। রাত্রি ভোর হতে না হতে, পাখির ঘুম ভাঙ্গার আগেই মেথরেরা সহরের ময়লা পরিষ্কার করে। এক একটা দল বের হয় ঝাড়ু হাতে রাস্তা ঝাঁট দিতে। কয়েকটা দল বের হয় মাথার ওপর পুরীষবাহী বড় বড় টিনের টব নিয়ে। দু'চাকার ওপর পিপে বসানো একটা অদ্ভুত ধরণের গাড়ী আছে মিউনিসিপ্যালিটির। একটা বুড়ো বলদ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গাড়ীটাকে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। পিপের গায়ে দু'সারি ফুটো আছে। খুব ভোরে উঠলেই দেখতে পাওয়া যাবে, পিপে গাড়ীটা ভ্রাম্যমান ধারাযন্ত্রের মত হেলে দুলে কঁকিয়ে কঁকিয়ে চলে যাচ্ছে, রাস্তার ধুলোর দৌরাত্ম্যকে শান্তিজল ছিটিয়ে শান্ত ক'রে দিয়ে। আমাদের অহিভূষণের চাকরীটা হলো—এই সব কাজ তদারক করা। তারই জন্য বাইশটি টাকা মাইনে পায় অহি। লেখা পড়া শেখে নি, বাপ বেঁচে নেই, বাপের পয়সাও ছিল না। মা আছে, মায়ের অসুখও আছে। তা ছাড়া নিজের পেটের দায় তো আছেই। সামর্থ্য নেই, যোগ্যতা নেই, তাই বোধ হয় এই সামান্য জীবনের দায়টুকু মেটাতে গিয়ে, উপায় খুঁজতে খুঁজতে একেবারে নরকের কাছাকাছি চলে এসেছে অহি। দুপুর বেলা যখন আদালতে দশটার ঘণ্টা বাজে, অর্থাৎ ঠিক যে-সময়ে ভদ্রলোকের কাজের জীবন কলরব ক'রে ওঠে, সেই সময়ে এক ভাঙা ঘরের নিভৃতে অহিভূষণের ক্লান্ত শরীর নিঃশব্দে ঝিমোয়। সূর্য উঠলে আমরা ঘরের বার হই। সূর্য উঠলে অহি ঘরে ঢোকে। আমরা কাছারী রোড দিয়ে গাড়ী ঘোড়া শব্দ ও জনতা ভেদ ক'রে যাই জীবিকা অর্জন করতে। অহি ঘুরে বেড়ায় নির্জন নিস্তব্ধ ও অবসন্ন শেষ রাত্রের অস্পষ্ট গলি ঘুঁজির মোড়ে, ড্রেন পায়খানা ডাষ্টবিনসঙ্কুল একটা ক্লেদাক্ত জগতের চোরাপথে।

বিকেল বেলা অহিকে আরও দু'বার কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়। লক্কড় সাইকেলটার পিঠে সওয়ার হয়ে মাইল দেড়েক দূরে সহরের বাইরে গিয়ে শ্মশান ঘাটের সিঁড়িতে একবার দাঁড়ায়। ডোমটার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে, মড়া আর চিতার হিসাব নেয়। তার পরেই গিয়ে দাঁড়ায় খালের ধারে—ময়লা ময়দানের কাছে। দু'টো ইনসিনারেটারের চিমনি থেকে দগ্ধ পুরীষের দুর্গন্ধ ধূম বাতাস আচ্ছন্ন করে। অহির সাইকেলের শব্দে একটা অলস গৃধিনীর দল আবর্জনার স্তূপের আড়ালে চমকে ওঠে, বড় বড় পাখা ছড়িয়ে আকাশে উঠে চক্কর দিয়ে উড়তে থাকে। অহি দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। উড়ন্ত গৃধিনীর পাখার চঞ্চল ছায়া আর শব্দের নীচে দাঁড়িয়ে এইখানে সূর্যাস্ত দেখে অহিভূষণ।

কথায় কথায় অহি বলে—এমন চাকরী থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? চাকরীর ব্যাপারে কত ভাবে ফাঁকি দিচ্ছে অহি, সেই সব বিবরণ বেশ ফলাও ক'রে মাঝে মাঝে শোনায়। আমাদের একেবারে নিঃসংশয় করবার জন্য অহি প্রায়ই বলে—'সত্যি বলছি ভবানী, প্রাণ গেলেও আমি গলি ফলির ভেতর ঢুকতে পারবো না।'

বারীন প্রশ্ন করে—'ময়লা ময়দানে যেতে হয় না তোকে?'

অহি—'কস্মিন্ কালেও না। আমি দূরে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েই কাজ দেখি।'

আমি জিজ্ঞাসা করি—'চিতে গুনতে যাস না আজকাল?'

অহি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়—'মোটেই না! ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হিসাব নিই, শ্মশানে নামি না।'

একটু চুপ ক'রে থেকে অহি আবার নিজে থেকেই একটু অস্বাভাবিক ভাবে গর্ব ক'রে বলতে থাকে—'কি ভেবেছে মিউনিসি-

প্যাপিটি, বাইশটে টাকা মাইনে দেয় বলেই বামুনের ছেলেকে দিয়ে যাচ্ছেতাই করিয়ে নেবে ?'

আমরা প্রায় একসঙ্গে সবাই হেসে ফেলতাম। অহি একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতো, আমাদের হাসির অর্থ বুঝবার চেষ্টা করতো।

অহির কথা নিয়ে বেশীক্ষণ মাথা ঘামাবার মত উৎসাহ কারও ছিল না। কথা প্রসঙ্গে এক আধটু যা হলো তাই যথেষ্ট। পর মুহূর্তেই আমরা উৎকর্ণ হয়ে উঠতাম, কারণ বারীন একটী সুস্বাদু কাহিনী পরিবেশন আরম্ভ করে দিয়েছে—'কি বলবো ভাই, আজকাল যা সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে ললিতা! ফিক্ ফিক্ করে হাসে। ইয়া বড় বড় চোখ ক'রে বেপরোয়া তাকিয়ে থাকে। হাব ভাবে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে যে…কিন্তু আমি ভাই ভিড়তে চাই না।'

অহি বেফাঁস রসিকতা ক'রে বসে—'তাহলে আমি ভিড়ে যাই, কি বল ?'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বন্ধ ক'রে দিয়ে, মুখটা কঠোর ক'রে অহির দিকে তাকিয়ে বারীন বলে—'তোমাকে এর মধ্যে ফোড়ন দিতে বলেছে কে ?'

এ-সব কুৎসার অম্বলে ফোড়ন সচরাচর আমরাই দিয়ে থাকি। অহি কখনো মন্তব্য করতো না, ভদ্র বাড়ীর তরুণীদের নামে কোনো রসাল প্রসঙ্গ উঠলেই অহি বরং নিস্পৃহ ভাবে চুপ করে থাকতো। অতি পরিচিত এই সব প্রতিবেশিনীদের কাহিনীগুলিও ওর কাছে আজ যেন রাণী পরী আর দেবীর রূপকথার মত এক অতি দূর অলীক দেশের গল্প হয়ে গেছে। এই সব প্রসঙ্গে তাই অহিকে কখনো উৎসাহ প্রকাশ করতে আমরা দেখি নি। এই প্রথম হঠাৎ ভুল করে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বারীনও তাকে সাবধান ক'রে দিল। চুপ ক'রে রইল অহি। আর কখনো

তার এ ভুল হয় নি। অহি এই ভাবেই তার অধিকারের সীমা আমাদের ধমক খেয়েই বুঝে ফেলে। যেন মাথা পেতে ত্রুটী স্বীকার ক'রে নেয়। মেলা মেশার দিক দিয়ে আমাদেরই আড্ডার ছেলে অহিভূষণ, আমাদেরই প্রাক্তন সহপাঠী, এক সহরের ছেলে। কিন্তু মনের রুচির দিক থেকে সে যে ভিন পাড়ার লোক, সে তত্ত্ব তাকে আমরা কারণে অকারণে বুঝিয়ে দিই। অহিও বুঝতে পারে।

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম ছিল। সেদিনের আড্ডায় বারীন সেই মেয়েটির নামেই যা খুশি তাই বলছিল। মেয়েটির নাম বন্দনা। এই বন্দনারই মতিগতি একটু অ্যানালিসিস ক'রে বারীন বুঝতে পেরেছে যে…

বন্দনার নামে যখন কথা উঠতো, তিলমাত্র ভদ্রতার সঙ্কোচ বা শ্রদ্ধার বালাই কেউ অনুভব করতো না। বিশেষ ক'রে বারীন। বন্দনাকে একটু ভাল ক'রেই আমরা চিনে ফেলেছি। তাই অবিশ্বাস করার মত কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে, কষ্ট ক'রে এতটা ভাববার কোনো দরকার ছিল না আমাদের। অন্য কোনো মেয়ের সম্পর্কে বারীনের রসনার অসংযম হয়তো আমরা বাধা দিতাম, প্রশ্ন করতাম, সন্দেহ প্রকাশ করতাম। কিন্তু বন্দনা ঠিক সেই সব মেয়েদের দলে নয়, তাদের বাইরে, অনেক নীচে। যদিও আমাদেরই পরিচিত পুলিন বাঁড়ুজ্যের মেয়ে বন্দনা। বন্দনার চারিত্রিক রহস্য নিয়ে সবাই আপসোস করতো, কটূক্তি করতো, ঘৃণায় ছটফট করে উঠতো। কখনো বা এক ঝাঁক রসিকতার মাছি ভন্ ভন্ করে উঠতো। অহিও হেসে হেসে মাথা নেড়ে মন্তব্য করতো—ডোবালে ডোবালে, ভদ্র সমাজের নাম ডুবিয়ে ছাড়লে ছুঁড়ি।

শুধু এই একটি ক্ষেত্রে অহির অধিকারের সীমা স্মরণ করিয়ে দেবার কথা আমাদের কারও মনে হতো না। এক্ষেত্রে অহির

অধিকার যেন পরোক্ষভাবে আমরা স্বীকার ক'রে নিয়েছিলাম। বন্দনাকে কুৎসা করার এই সমানাধিকার পেয়ে অহি যেন ধন্য হয়ে যেত। মুখ খুলে রসিকতা করতো অহি। এই একটি সুযোগকে বার বার সদ্ব্যবহার ক'রে অহি উপলব্ধি করতো—সে আমাদেরই মধ্যে একজন।

শুধু সন্ধ্যে হলে অহি আমাদের আড্ডায় একবার আসে। না এসে পারে না। নেশাড়ে মানুষ যেমন সন্ধ্যে হলে একবার শুঁড়ির দোকানে না যেয়ে পারে না, অহির অবস্থাটা বোধ হয় সেই রকম। সেই কবে আট বছর আগে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো অহিভূষণ, একই রিং-এ বক্সিং করতো, একই প্যারালাল বার-এ পীকক হতো—সেই পুরানো নেশা আজও বোধ হয় ছাড়তে পারে নি অহি। একটু বেশী ধোপ-দুরস্ত কাপড়-চোপড় পরে সন্ধ্যে বেলা আমাদের আসরে দেখা দেয়। আমাদের বিদ্রূপ বিরক্তি অশ্রদ্ধা—সবই অকাতরে সহ্য করে। ছেলেবেলায় অহির এক একটা কঠোর ষ্ট্রেট লেফ্‌ট্‌ ও ডান হাতের পাঞ্চ্‌ কতবার আমাদের ছিটকে বের করে দিয়েছে রিং থেকে বাইরে—তিন হাত দূর। আজ যেন সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছে অহি। আমাদের সব অশ্রদ্ধার আঘাত সহ্য ক'রে, সাধ করেই পরাজিত হয়ে আমাদের রিং-এর মধ্যে থাকতে চায় অহিভূষণ।

—একটু ডিসট্যান্সে যেতে হবে ভাই, প্রাইভেট টক আছে।

অহির অনুরোধ শুনে উঠে গিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়ালাম। বললাম—'কি বলছিলি, বল।'

অহি—'তোর কাকাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে ভাই, যেন আমার নামটা কেটে না দেন।'

আমার কাকা হলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। কাকা

একটু বেশী পরোপকারী ও সদয় মানুষ। তাই আশ্চর্য হলাম, অহিভূষণের মত এক গরীব কর্মচারীর চাকরীটা খাবার মত উৎসাহ তাঁর কেন হবে ?

বললাম—'তোকে বরখাস্ত করার কথা হয়েছে নাকি ?'

—'বরখাস্ত নয় ভাই, আমার নামটা কেটে দিচ্ছেন।'

—'বরখাস্ত নয়, নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে, কথাটার অর্থ বুঝতে পারছি না, অহি। ঠিক করে বল।'

—'তুই তো জানিস, আমার পোস্টটার নাম ছিল···'

—'না জানি না।'

—'আমি হলাম এ সি এস।'

—'সেটা আবার কি জিনিস ?'

—'আমি হলাম অ্যাসিষ্টেণ্ট কনৃজারভেন্সী সুপারভাইসার। পাঁচ বছর ধরে এই নাম চলে আসছে। আজ হঠাৎ তোর কাকা চেয়ারম্যান হয়ে কোথায় একটু উপকার করবেন, না উঠে পড়ে লেগেছেন আমার নামটার পেছনে। নামটা বদলে দিচ্ছেন।'

—'তাতে তোর ক্ষতিটা কি ? মাইনে তো আর কমলো না।'

—'না মাইরি, সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নাম সহ্য করতে পারবো না, মাইরি। তুই বল ভাই, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে···'

—'তোরই বা এত নাম নিয়ে মাথাব্যথা কেন ? তোর আগে যে লোকটা সর্দার ছিল, সেই মানৃকিরাম যে তোর চেয়েও বেশী মাইনে পেত।'

অহির মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। একটু অভিমান ক'রেই যেন বললো—'শেষে তুইও মানৃকিরামের সঙ্গে আমার তুলনা করলি, ভবানী ?'

একটু রাগ ক'রে বললাম—'মানৃকিরাম তোর চেয়ে ছোট কিসে

রে অহি? মানুষকে যে খুব ছোট ক'রে দেখতে শিখেছিস, অথচ....'

অহি শুধু চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না। এইভাবেই সামান্য একটা ধমকে তার সব বিদ্রোহ শান্ত হয়ে যায়। আজও চুপ ক'রে আমার ধমক আর মন্তব্যটাকেই মেনে নিল অহি।

বাড়িতে ফিরে এসে অহির কথাটা কেন জানি বারবার মনে পড়ছিল। কাকাকে হেসে হেসে বললাম—'অহি নামে আপনাদের মিউনিসিপ্যালিটির একজন প্রকাণ্ড অফিসারের ডেসিগ্‌নেশানটা নাকি আপনি খারিজ ক রে দিচ্ছেন?'

কাকা উত্তর দিলেন—'হুঁ, ঐ নামটা আইনত চলে না। ঐ নাম থাকলে মাইনে ও গ্রেড আইন মাফিক করতে হয়। তা ছাড়া, তাহলে অহির চাকরীও থাকে না। কেন না, অ্যাসিষ্টেণ্ট কনৃজারভেন্সী সুপারভাইসার রাখতে হলে ট্রেনিং-নেওয়া পাশ করা লোক চাই। অহির তো সে-সব যোগ্যতা নেই।'

—'কিন্তু সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নামটা সত্যিই বড় বিশ্রী। গরীব হলেও ভদ্রলোকের ছেলে তো, অহির মনে বড় লেগেছে।'

কাকা দুঃখিত হয়ে বললেন—'কি করবো বল? কোনো উপায় নেই। অহির মাইনে তিন টাকা বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আছে আমার এবং বাড়িয়ে দেবো ঠিক, কিন্তু ঐ পোস্টটা, ও ভাবে ঐ নাম দিয়ে রাখবার উপায় নেই। আইনে বাধে।'

পরদিন সকাল বেলা অহির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু ঘরে বসে অহির গলার স্বর শুনতে পেয়ে আবার ঘটনাটা নতুন ক'রে মনে পড়ে গেল। কাকার সেরেস্তায় এসে অহি কাকাকে সেই অনুরোধ নিয়েই আবার পাকড়াও করেছে।

অহি বলছিল—'আমার এই পোস্টের নামটা বদলে দেবেন না কাকাবাবু।'

কাকা বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—'কেন হে কাকাবাবু?'

কাকার উত্তরটার মধ্যে এবং গলার স্বরে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাসও ছিল যেন। অহির মুখে এই 'কাকাবাবু' ডাক হয়তো তিনি পছন্দ করলেন না।

কাকার সেরেস্তার কাছে দাঁড়িয়ে একটু আড়াল থেকে উঁকি দিলাম। দেখলাম, অহি দাঁড়িয়ে আছে। অহির নোংরা খাকি হাফ প্যাণ্ট আর বগলদাবা হাজিরা খাতাটা ওর সর্দারীর সাজটা নিখুঁত ক'রে তুলেছে। অহির মুখটা আজও কিন্তু সেই পুরানো ধাঁচেই রয়ে গেছে। নাক আর চিবুকে সেই দক্ষিণী নটরাজের ব্রঞ্জের মত ছাঁদটা আজও মুছে যায় নি। গড়নটা কঠিন, কিন্তু ছাঁদটা কোমল। এই অহি একদিন আমাদের স্কুলে প্রাইজের অনুষ্ঠানে কপালে রক্তচন্দনের তিলক কেটে মেঘনাদ সেজেছে, আবৃত্তি করেছে। কী সুন্দর ওকে মানাতো!

আপাতত দেখছিলাম, অহিভূষণ কাকার প্রশ্নে একটু কাঁচু-মাচু হয়ে বললো—'আজ্ঞে আমি বলছিলাম...'

কাকা—'কিছু বলতে হবে না তোমাকে। আমি যা করেছি তোমার ভালোর জন্যই করেছি। হয়তো মাইনে কিছু বাড়িয়ে দেব যদি...'

অহি—'মাইনে বাড়াবার জন্য আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না, স্যার। কিন্তু আমার পোস্টের নামটা যদি আপনি একটু অনুগ্রহ ক'রে...'

কাকা আমার পরম দয়ালু মানুষ, কিন্তু ভিক্ষে করবার এত বস্তু

থাকতে কেউ এসে পোস্টের সম্মান ভিক্ষে করবে, সে-ঔদ্ধত্যকে বোধ হয় পৃথিবীর কোনো দয়ালু প্রশ্রয় দিতে পারেন না। কাকা হঠাৎ ভয়ানক ভাবে চটে গিয়ে চোখ পাকিয়ে হিন্দী করে বলতে লাগলেন।—'মাইনে বাড়ানোর দরকার নেই, না? তবে চাকরীটারই বা কি দরকার হে সর্দার? খুব বাড় বেড়েছে দেখছি?'

—'আজ্ঞে না হুজুর! সঙ্গে সঙ্গে এক সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের মুখ দীনতায় সঙ্কুচিত হয়ে আর্তস্বরে যেন ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে উঠলো।'

কাকা বললেন— 'যাও, খাড়া মৎ রহো।'

অহি আজকাল আর আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় প্রতিদিন আসে না। তবে আসে মাঝে মাঝে, একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। অহি বোধ হয় আমাদের অন্তরঙ্গতার সীমা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে।

অহির আচরণের এই পরিবর্তন সকলেই লক্ষ্য করলো। আমিই একদিন সকলকে রহস্য ফাঁস ক'রে দিলাম—মিউনিসিপ্যালিটী অহিকে সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নাম দিয়েছে, অ্যাসিষ্টেণ্ট কনজারভেন্সী সুপারভাইসার নামটা রদ ক'রে দেওয়া হয়েছে, তাই অভিমান হয়েছে অহির। কাকার কাছে এই নিয়ে তর্ক করতে গিয়েছিল। কাকা ধমক দিয়ে খেদিয়ে দিয়েছেন।

এর পরে যেদিন অহি আড্ডাতে এল, সকলে মিলে বেশ মিঠেকড়া ক'রে ধমকে দিল—'তোর আবার এই সব ঘোড়ারোগ কেন রে অহি? মাইনের পরোয়া করিস না, তাই নিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে মুখের ওপর তর্ক করতে যাস। সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের কাজটা করবি, অথচ বললে তোর একেবারে মাথা কাটা যাচ্ছে। তুই কি ভাবছিস নিজেকে, তুই একটা ভয়ানক রকমের অফিসার?'

ধমক খেয়ে প্রতিবাদ করে না অহি। অভিযোগ স্বীকার ক'রে নেয়। আজও অহি নিরুত্তর থেকে অভিযোগ স্বীকার ক'রে নিল।

কিন্তু বলিহারি ওর ধৈর্য আর সহ্যগুণ! শুধু আমাদের আড্ডার স্পর্শ টুকুর লোভে ও সব সহ্য করতে পারে।

পর পর অনেকদিন পার হয়ে গেল, অহি আর আড্ডায় আসে না। হঠাৎ একদিন হাসতে হাসতে ক্লাবের বৈঠকে দেখা দিল অহি।

বীরভূমের এক গাঁয়ের এক গরীব স্কুলমাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে আমাদের অহির বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। অহি নিজে গিয়ে মেয়েকে দেখে এসেছে। আমাদের কাছে একটা সলজ্জ আনন্দে সব কথা বললো অহি—মেয়েটি দেখতে বেশ, ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে, গানটানও গাইতে পারে।

অহি যেন তার জীবনের এক নতুন সূর্যোদয়ের কথা বলে চলে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারে নি যে, কী বিসদৃশ, কী অশোভন, কী অন্যায় কুকাণ্ডের একটি বার্তা সে আমাদের কানের কাছে ছেড়ে দিয়ে গেল। আমাদের মনের শান্তি নষ্ট হলো।

আমরা বুঝলাম, কত বড় ভাওঁতা দিয়ে এক ভদ্রলোকের মেয়ের সর্বনাশ করতে চলেছে অহি। বেচারী স্কুলমাষ্টার কখনো কল্পনাও করতে পারে নি যে এক সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের হাতে তাঁর মেয়েকে তিনি সঁপে দিতে চলেছেন। তিনি হয়তো শুধু জানেন, অ্যাসিষ্টেণ্ট কন্‌জারভেন্সী সুপারভাইসার নামে এক করকরে অফিসারের সঙ্গে তাঁর মেয়ের···

সমাজের একটা স্বাভাবিক আত্মরক্ষা করার শক্তি আছে। সেদিনই দু'পাতা চিঠি লিখে সব ব্যাপার আমরা জানিয়ে দিলাম স্কুলমাষ্টার ভদ্রলোককে। অহিও তিন দিন পরে বীরভূমের এক গেঁয়ো ডাকঘর থেকে টেলিগ্রাম পেল—বিয়ের প্রস্তাব বাতিল।

আমাদের যা করবার সব গোপনেই করেছিলাম। অহি কী

বুঝলো, তাও আমরা জানি না। কিন্তু অহি আর আমাদের আড্ডায় এল না। এক মাসের মধ্যে নয়, এক বছরের মধ্যে একবারও নয়। এতদিনে সত্যি ক'রে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অহি।

মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বোধ হয় অনেক দিন আগে থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল অহি। শুধু ধোপদুরস্ত কাপড় পরে জোর ক'রে ভদ্রলোক সাজবার চেষ্টা করতো। অল্পদিনের মধ্যে আমরা দেখলাম, হ্যাঁ, খাঁটি সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার বটে অহি। হাজিরা খাতা বগলে নিয়ে গলিতে গলিতে নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়ায়, শ্মশানের চড়ায় নেমে চিতা গুনে আসে, ময়লা ময়দানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রেঞ্চ কাটায়। ড্রেনের পাশে বসে মেরামত তদারক ক'রে। নোংরা খাকি হাফ প্যাণ্ট পরে ক্লেদাক্ত পৃথিবীর চিহ্নিত পথে আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে চরে বেড়ায় অহি—লক্কড় সাইকেল আর্তনাদ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুলিনবাবু আর বন্দনা ঠিক এই ধরনের সমস্যাকেই একবার জটিল ক'রে তোলবার চেষ্টা করলো।

দেনা দৈন্য আর বেকার অবস্থায় জীবনের বারো আনা ভাগ সময় পণ্ড করে দিয়ে পুলিন বাঁড়ুয্যে শেষকালে জুতোর দোকান খুলেছিলেন। আমরা দেখতাম, পুলিনবাবুর দোকানে মেঝের ওপর তিন চারজন মুচি সকাল দুপুর সন্ধ্যা জুতো সেলাই ক'রে। একটা কাঁচের আলমারী ছিল দোকানে, তার মধ্যে নতুন চামড়ার বাণ্ডিল সাজানো— ক্রোম, উইলোকাফ, কিড আর শ্যামোয়া। দোকান ঘরের মধ্যেই কিছুটা স্থান ভিন্ন ক'রে, একটা ভাল মেহগনি টেবিল আর চেয়ার নিয়ে বসে থাকতেন পুলিনবাবু। টেবিলের পাশে আবার একটা সুন্দর রঙীন পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে বসলে মুচিদের আর ঠিক পাশাপাশি বা মুখোমুখি দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ রঙীন

পর্দাটা যেন পুলিনবাবুর মনের একটা সতর্ক ও জাগ্রত শ্রেণীমর্যাদার প্রতীকের মত ঝুলতো। মুচিদের কর্মভূমি থেকে তিনি যেন স্পষ্ট ক'রে তাঁর জীবনের আসরটুকু সযত্নে ভিন্ন করে রাখতেন। শত হোক, পরলোকগত ত্রৈলোক্য পণ্ডিতের নাতি তো! সাত-পুরুষের কৌলিক চেতনাকে একটা উপার্জনের দায়ের সঙ্গে একাকার ক'রে দিতে পারেন না তিনি। তিনজন মুচির মধ্যে একজনকে তিনি মিস্তিরি বলে ডাকতেন। আলমারী থেকে চামড়া বের করে মাপ মত কেটে কেটে মুচিদের দেওয়া, খদ্দেরের পায়ের তলায় কাগজ পেতে মাপ এঁকে নেওয়া ইত্যাদি সব কাজ মিস্তিরিই করে। জুতোর দোকানের জুতোত্বর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন না পুলিনবাবু, তাঁর সম্পর্ক শুধু দোকানত্বের সঙ্গে। এর চেয়ে বেশী নীচে নামতে পারেন না পুলিনচন্দ্র বাঁড়ুয্যে।

এই পুলিনবাবুর মেয়ের নাম বন্দনা। এই সহরের স্কুলেই পড়েছে, এ-পাড়া আর ও-পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মিশে কোনকালে মহিলা সমিতির বাৎসরিকীতে অভিনয় করেছে। চার বছর আগের কথাই ধরা যাক, আমার ভাগ্নীর বিয়েতে বন্দনা একাই গান গেয়ে বাসর জমিয়েছে। বন্দনার স্কুল-বান্ধবীরা অনেকেই আজ আর বাপের বাড়িতে নেই; শ্বশুরবাড়ি থেকে তারা মাঝে মাঝে যখন আসে, সবারই সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় তাদের। শুধু দেখা হয় না বন্দনার সঙ্গে। বন্দনা আজ সেই পুরাতন সখীত্বের বৃত্ত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বন্দনার খোঁজ বড় কেউ করে না। বন্দনা এখন কী বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, সবাই জানে সে-কথা। সেই সখীত্বের আগ্রহ দূরে থাক, তাদের মনের দিক দিয়ে অস্পৃশ্যতা গোছের একটা বাধা বন্দনাকে আজ একেবারে অস্পষ্ট ক'রে দিয়েছে।

হাসপাতালে কী একটা কাজ করছে বন্দনা! বন্দনার মা অবশ্য

লোকের কাছে বলেন—নার্সের কাজ। কিন্তু তাই বা কি ক'রে হয়? বন্দনা তো নার্সবিদ্যা পাশ করে নি। যাই হোক এতটা বাড়াবাড়ি পুলিন বাঁড়ুয্যের উচিত হয় নি। জীবনে টাকার প্রয়োজন কার না আছে? কিন্তু তাই বলে সব ভদ্রয়ানার সংস্কার অমান্য ক'রে, সমাজের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির তোয়াক্কা না ক'রে, রুচি-অরুচির বালাই না রেখে, শুধু কাজ আর পয়সাকে শ্রেষ্ঠ ক'রে তোলা মানুষের লক্ষণ নয়। এ কে জীবিকা অর্জন বলে না, এটা হলো জীবনকে বিকিয়ে দেওয়া। পুলিন বাঁড়ুয্যে খুবই গরীব সন্দেহ নেই। তার গরীবত্বের জন্য অবশ্য আমাদের সবারই সমবেদনা আছে। কিন্তু গরীবত্ব ঘোচাবার যে পথ তিনি বেছে নিলেন, সেই পথটাকে কেউ সম্মান করবে না।

পুলিনবাবু বোধ হয় তাঁর ভবিষ্যৎটা বুঝতে পারেন নি, নইলে এতটা স্পর্দ্ধা তাঁর হতো না। কিন্তু অতি অল্পদিনেই তিনি বুঝলেন, একেবারে মর্মে মর্মে বুঝলেন।

কাকা একদিন আমাকে ডেকে বললেন—'হ্যাঁ রে ভবানী, পুলিন চামারের দোকানে জুতো-টুতো কেমন তৈরী করে? বেশ ভাল?

কাকা অক্লেশে যে কথাটা বললেন, তাতেই হঠাৎ একটা শক্ পেলাম যেন। আজ এক বছরের মধ্যে পুলিন বাঁড়ুয্যে কাকার কাছে কত সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মে পুলিন চামার হয়ে গেছে!

বিব্রত ভাবে উত্তর দিলাম—'হ্যাঁ, ভালই তৈরী করে।'

কাকা—'তাহলে এবার পূজোর সময় পুলিন চামারকেই অর্ডার দিস্!'

কথাটা যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। ঠাট্টা ক'রে নয়, বেশ সহজভাবেই সকলে পুলিন চামার কথাটা ব্যবহার করে। পুলিন-বাবুও নিশ্চয় স্বকর্ণে কথাটা শুনেছেন। এখন বুঝুন তিনি, এই নতুন

উপাধির গৌরব প্রতি মুহূর্তে তিলে তিলে উপভোগ করে প্রায়শ্চিত্ত করুন।

জুতোর অর্ডার দিতে গিয়ে দেখলাম, ক'মাসের মধ্যে আশ্চর্য রকমের বদলে গেছেন পুলিনবাবু। এক বছর আগেও আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন। আজ আমাকে 'আপনি' ক'রে বলছেন। আলমারী খুলে নানা রকম চামড়া বের করে দেখালেন। এক জোড়া অক্সফোর্ড হান্টিং-এর দরকার ছিল আমার। পুলিনবাবু খুশি হয়ে আমার পায়ের তলায় একটা কাগজ পাতলেন, পেন্সিল দিয়ে মাপ এঁকে নিলেন। ভয়ানক রকম একটা অস্বস্তির মধ্যে আমার পা-টা সির্‌সির্ করে উঠলো। যেন একটা অপরাধ করছি, মনের কোণে এই রকম একটা দুর্বলতা নিঃশব্দ গঞ্জনার মত পীড়া দিতে লাগলো। এই রকম অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, পুলিনবাবু আমার পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে জুতোর মাপ নিচ্ছেন। পুলিনবাবুর হাতের পেন্সিল এক অপার্থিব তুলির মত সুড়সুড়ি দিয়ে আমার পায়ের পাতার চারদিকে ঘুরছে। আমি দেখছিলাম, প্রৌঢ় পুলিন-বাবুর কাঁচা-পাকা চুলে ভরা মাথাটা আমার হাঁটুর কাছে হেঁট হয়ে আছে।

এর পরেও দেখেছি, সেই মেহগনি টেবিল চেয়ার আর রঙীন পর্দা নেই। মিস্তিরি নেই। পুলিনবাবু মেজের ওপর জুৎ ক'রে বসে নিজেই কাঁচি দিয়ে হিসেব মত চামড়া কেটে মুচিদের দিচ্ছেন। পুলিন চামারের দোকান সত্যিই সার্থক হয়ে উঠেছে এতদিনে।

বন্দনাকেও আমরা প্রায়ই দেখতে পেতাম, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বা রিক্‌সায় চড়ে হাসপাতালে যায়। বারীন সব চেয়ে বেশী চটে যেত বন্দনার সাজসজ্জার নিষ্ঠা দেখে। নার্সদের অ্যাসিষ্টেণ্ট, কুড়ি টাকা মাইনে, তার জুতো শাড়ি আর ব্লাউজের এতটা বাহার

একটু বিসদৃশ ঠেকে বৈকি! তার ওপর আবার মাঝে মাঝে রিক্সায় চড়ে! আমরা অবশ্য বন্দনার পক্ষ নিয়ে কখনো-সখনো বারীনকে প্রতিবাদ করতাম—একটু রিক্সাতে চড়লোই বা! এতটা পথ এই দুপুরের রোদে চলাফেরা করা একটা মেয়ের পক্ষে কষ্টকর নয় কি?

বারীন একেবারে ক্ষেপে উঠতো—'থাক থাক, আমাকে আর শেখাতে এস না কেউ। জমকালো শাড়ি আর রিক্সার পয়সা যে এমনিতেই হয়, সে তত্ত্ব আমি বুঝি।

পথে বন্দনার সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, বারীন আমাদের সঙ্গে থাকলে বন্দনা কখনো ভুলেও চোখ তুলে তাকাতো না। একটু সঙ্কুচিত হয়ে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিত। কখনো বা চকিতে মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠতো, যেন হঠাৎ ভয় পেয়েছে। বারীন আবার চটে উঠে বলতো—ঠিক এই, এই ধরনের হাব ভাব যে-সব মেয়েদের দেখা যায়, যারা ইচ্ছে ক'রেও হাসতে পারে না, চোখ তুলে তাকাতে পারে না, তাদের মতিগতি একটু অ্যানালিসিস করলেই বুঝতে পারবে যে, তারা শুধু চায়···

পুলিনবাবু তো এরই মধ্যে দমে গিয়ে একেবারে অমানুষ হয়ে গেছেন। কিন্তু পুলিন-গিন্নী দমবার পাত্রী নন। যার স্বামী জুতো বেচে, মেয়ে সদর হাসপাতালে কে জানে কী করে, তাকে আজও একটু লজ্জিত হতে দেখি নি। যে কোনো পরিচিতা প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা হলে আলাপক্রমে একবার নিজের বংশগর্বটাকে বড় ক'রে এবং আলাপিতাকে একটু নীচু ঘর প্রমাণ না ক'রে তিনি শান্ত হন না। প্রয়োজন হলে সৌজন্য ভুলে ঝগড়া করতেও কুণ্ঠিত হন না। যে-সব বুড়ী নির্জলা একাদশী করতে পারে না, তাদের গায়ে পড়ে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসেন। তাঁকে কেউ আমল দেয় না, তবু গায়ে পড়ে

সবাইকে বিব্রত করেন। পুলিনবাবু আর বন্দনার ঠিক উল্টোটি হলেন পুলিন-গিন্নী। কোনো বামুনের বাড়িতে এক ফোঁটা গঙ্গাজল নেই, কারা তিথি নক্ষত্র মানে না, কার মেয়ের অলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল—সব খবর রাখেন পুলিন-গিন্নী এবং সবাইকে তার জন্য কটূক্তি করতে ছাড়েন না।

কবে এবং কী ক'রে পুলিন-গিন্নী বন্দনার একটা বিয়ের ব্যবস্থাও প্রায় পাকাপাকি ক'রে ফেলেছেন, তা আমরা আগে জানতে পারি নি। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। পাত্রের মামা বন্দনাকে আশীর্বাদ করতে এলেন এবং উঠলেন আমাদের বাড়িতে। পাত্রের মামা আমার কাকার বন্ধু। তাঁর কাছেই সব খবর শুনলাম—তাঁর ভাগ্নে অর্থাৎ পাত্রটী হলো পাটনার একজন প্রফেসর। বেশ ভাল চেহারা, মডার্ণ ও স্মার্ট ছেলে। পুলিন-গিন্নী বন্দনাকে নিয়ে মাত্র দু'দিনের জন্য পাটনা গিয়েছিলেন। মেয়ে দেখে পাত্র খুশি হয়েছে, পাত্রপক্ষ রাজী হয়েছে।

আমরা আশ্চর্য হলাম, কাকা আতঙ্কিত হলেন। তারপরে সবাই মিলে হাসতে লাগলাম। কাকার বন্ধুমশায় অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার ?'

কাকা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন—'যাক, আপনার ভাগ্য ভাল যে আমার এখানে উঠেছিলেন। আপনার ভাগ্নের জন্য অন্য সম্বন্ধ দেখুন। সব কথা পরে হবে। এখন বিশ্রাম করুন।'

রাত্রি বেলা ক্লাব থেকে ঘরে ফিরেই দেখি পুলিন-গিন্নী খুড়িমার সঙ্গে কথা বলছেন। বারান্দায় চেয়ার টেনে নিয়ে পুলিন-গিন্নীর কথাবার্তা শোনবার জন্য বসলাম।

পুলিন-গিন্নী যেন করুণভাবে আবেদন করছিলেন—'আপনি বিশ্বাস করুন দিদি, বন্দনা কখনো রোগীর বেডপ্যান ট্যান ছোঁয় না।

চাকরী করে এই মাত্র, তাই বলে ব্রাহ্মণের মেয়ে এতটা নোংরামি করতে পারে দিদি ?'

একবার উঁকি দিয়ে পুলিন-গিন্নীর চেহারাটা দেখলাম। সে চেহারাই নয়। একটা প্রচ্ছন্ন আশঙ্কায় পুলিন-গিন্নীর মুখটা নিষ্প্রভ হয়ে আছে। যেন তাঁর সর্বস্ব ডুবতে বসেছে। খুড়িমার কাছে যেন একটা পরিত্রাণের প্রার্থনা বার বার কাতর ভাবে শোনাচ্ছিলেন পুলিন-গিন্নী।

খুড়িমা বললেন—'এ-সব কথা আমায় বলে লাভ নেই। কর্তারা যা ভাল বুঝবেন, তাই হবে!'

পুলিন-গিন্নী যেন ফুঁপিয়ে উঠলেন—'আপনি ভবানীর কাকাকে একটু বুঝিয়ে বলুন দিদি। ছেলের মামা ওঁর বন্ধু। আমি জানি, উনি হাঁ বললেই বিয়ে হবে, উনি না বললেই বিয়ে ভেঙে যাবে। উনি তো বন্দনাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন, উনি জানেন বন্দনা কেমন মেয়ে।'

খুড়িমা বললেন—'তাই হবে। উনি যদি ভাল বোঝেন তবে…'

পুলিন-গিন্নী ওঠবার আগে খুড়িমার হাত ধরে আর একবার অনুরোধ করলেন—'আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন দিদি।'

পুলিন-গিন্নী যাবার সময় কাকার বৈঠকখানার দরজার কাছে হঠাৎ কী ভেবে দাঁড়ালেন। কাঁকা তখন তাঁর বন্ধুকে এই কথা বোঝাচ্ছিলেন—'মেয়ে হল হাসপাতালের জমাদারণী, এই রকম একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার ভাগ্নের বিয়ে দিতে চান ?'

পাত্রের মামা বাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব থেকে বললে—'না।'
কথাগুলি কানে যাওয়া মাত্র, পুলিন-গিন্নী ছটফট করে পালিয়ে গেলেন।

পুলিন-গিন্নীর ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল, এই ব্যাপারে বোধ হয় খুশি

হলো সবাই। বারীন খুশি হলো এই কারণে যে, বন্দনার বিয়ে ভেঙে গেল। বন্দনার চেয়েও কত গরীবের মেয়ের বিয়ে হয়েছে বড়লোকের সঙ্গে। তার মধ্যে তো বিসদৃশ কিছু কেউ দেখে নি। গরীব বলে নয়, পুলিন বাঁড়ুয্যে আর বন্দনা, বাপ বেটি মিলে যা বেপরোয়া জুতোটুতো বেচতে আরম্ভ করলো—তারই ফল ফলছে একে একে। সমাজে কুলের প্রশ্ন হয়তো বড় পুরনো হয়ে গেছে, সে-সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এটা শীলের প্রশ্ন। এক সমাজে থাকতে হলে একই রকম শীলাচার মানতে হবেই। তার ব্যতিক্রম হলে সমাজ ক্ষমা করতে পারে না। আমরা কালচারের দিকটাই দেখছিলাম।

আমরা যে ভুল করি নি, তার প্রমাণ এই যে, বার বার দু'বার আমরা জিতে গেলাম। দু'বারই দু'টো অন্যায় হতে চলেছিল, তাই সামান্য আঘাতে ভেঙে গেল। প্রথম অহি, দ্বিতীয় বন্দনা।

ঐ মানুষগুলিও কত সহজে ও সামান্য আঘাতে ভেঙে গেল। সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার বলা মাত্র হু হু করে নেমে গেল অহি। পুলিনবাবুও তাই। চামার নামে শুধু একটা কথার কথায় যেন চামার হয়ে গেলেন। আসলে ওদের মনুষ্যত্বটাই স্ক্যাভেঞ্জার ও চামার হয়ে গিয়েছিল অনেক দিন আগেই। আমরা শুধু মুখোসটা খুলে দিয়েছি। আমাদের দোষ নেই। অপবাদ দিয়ে আমরা ওদের মিথ্যে করে দিয়েছি, একথা সত্য নয়। এবং যেটুকু শিক্ষা আমাদের বাকী ছিল, তাও অল্প দিনের মধ্যে চরম ক'রে শিখিয়ে দিল বন্দনা।

হৃদয়ভেদী এক একটি সংবাদ শুনতে পেলাম। সতু তাদের চাকরটাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে গিয়েছিল। কম্পাউণ্ডার এসে দুটো টাকা ঘুষ নিয়ে গেল। কোথা থেকে বন্দনাও এসে নির্লজ্জ ও নিষ্কম্প স্বরে চাইলো—আমারও পাওনা আছে। একটা টাকা দিতে হবে। না দিলে…

শশীদের বাড়িতে রোগিনী দেখতে লেডী ডাক্তার এসেছিলেন। তার সঙ্গে এসেছিল বন্দনা। লেডী ডাক্তার ফী নিলেন আট টাকা, বন্দনা পেলে এক টাকা। এই ন্যায্য পাওনা ছাড়া অক্লেশে হাত পেতে বকশিশ দাবী ক'রে বসলো বন্দনা—আরও কিছু দিতে হবে। শশীর বাবা কৃপণ মানুষ, বার বার আপত্তি তুললেন। বন্দনা জেদ ছাড়লো না। অপ্রস্তুত হয়ে, শশী তাড়াতাড়ি নিজের পকেট থেকে আট আনা বকশিশ দিয়ে উদ্ধার পেল।

সতু আর শশীর কাছে এই কাহিনী আমরা শুনলাম। বুঝলাম সত্যিই মনে-প্রাণে জমাদারণী হয়ে গেছে বন্দনা। একটা চক্ষুলজ্জারও ধার ধারে না।

আমাদের মনেও আর কোনো অনুশোচনা নেই। যা করেছি, ভালই করেছি। অহিভূষণকে বন্দনাকে ও পুলিনবাবুকে আমরা ঘৃণা করি না কিন্তু সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার, জমাদারণী ও চামারকে আমরা আমাদের রুচিগত জীবনের আসরে ও বাসরে গ্রাহ্য করতে পারি না। কোনো অন্যায় করি নি আমরা, ওদের কোনো ক্ষতি করি নি আমরা, ওদের জীবিকাই ওদের কাল্‌চার নষ্ট করেছে। ওরা যা ওরা তাই। আমরা শুধু নিজেদের বাঁচিয়েছি।

অনেক দিন পরে সমস্যাটা হঠাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে পৌঁছে গেল, যেন অদ্ভুত হয়ে উঠলো। ক্লাবে গিয়ে দেখলাম, টেবিলে দশ বারোটা রঙীন লেপাফাবদ্ধ চিঠি পড়ে রয়েছে। বিয়ের চিঠি। অহির সঙ্গে বন্দনার বিয়ে। অহি আমাদের নেমন্তন্ন করেছে।

বিশ্রী রকমের একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কি অদ্ভুত কাণ্ড! অহির সঙ্গে বন্দনার বিয়ে! এই কি উচিত হলো! কিন্তু কেন

উচিত নয়? এই বিয়ে সমর্থন করতে কোনো আনন্দ পাচ্ছি না। কিন্তু অসমর্থন করারও কোনো হেতু খুঁজে পাচ্ছি না।

বারীন অযথা রেগে পাগল হয়ে উঠলো। বারীনের মতে এটা হলো অহির সর্বনাশ। বারীন চেঁচাতে লাগলো—'শত বাজে লোক হোক অহি, তবু বন্দনার মত জমাদারণীর সঙ্গে ওর বিয়ে হতে পারে না।'

সতু ও শশী তার চেয়ে জোরে চেঁচিয়ে উত্তর দিল—'বন্দনা যতই যা তা হোক্, কোন সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়া উচিত নয়।'

দু'পক্ষেরই আচরণ বড় গর্হিত, হৃদয়হীনতার মত লাগছিল। ওদের নিয়ে আর মাথা ব্যথা কেন? ওরা সরে গেছে, ওরা আমাদের কেউ নয়। ওদের জীবিকা ভিন্ন, তাই ওদের জীবনও ভিন্ন। আজ কথা নিয়ে এতটা বিতণ্ডা করা আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা নয় কি?

কিন্তু কার মনে কি আছে কে জানে? পরের মঙ্গলের গরজেই সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সতু ও শশী পুলিনবাবুর কাছে বেনামী চিঠি ছাড়লো—যেন এ বিয়ে না হয়। এত ভাল মেয়ে আপনার, তার জন্য ঐ সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার পাত্র?

বারীন চার পাতা কাগজ ভরে অহিকে চিঠি লিখলো—সাবধান, নিজের সর্বনাশ ক'রো না। বন্দনার মত জমাদারণী মেয়েকে কি তুমি চেন না? যে-সব মেয়ে ইচ্ছে করেও হাসতে পারে না…চোখ তুলে ভদ্রভাবে তাকাতে পারে না, তাদের মতিগতি সম্বন্ধে একটু অ্যানালিসিস করলে দেখতে পাবে যে তারা শুধু চায়…

তাহলে কি এ বিয়ে ভেঙে যাবে? এর আগে দু' দু'বার তাদের আমরা ভেঙেছি। আমাদের নাগালের মধ্যে তারা এসেছিল, তাই।

আজ কিন্তু ঘটনা সে নিয়মের মধ্যে নেই। তারা নিজের পৃথিবীতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু? তবে কি কোনো উপায় নেই?

অহির বিয়ের নিমন্ত্রণ লিপি অর্থাৎ সেই রঙীন খামের চিঠিগুলি ক্লাবের টেবিলের ওপরেই পড়েছিল। কেউ আগ্রহ ক'রে তুলে নেয় নি, সঙ্গেও নিয়ে যায় নি। কোনো প্রয়োজন হয়তো ছিল না। প্রতি সন্ধ্যায় তাস খেলার সময় মাত্র দু'টি ক'রে সেই রঙীন চিঠির সদ্ব্যবহার করতাম। সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য কোনো পাত্র তাড়াতাড়িতে পাওয়া যেত না, এ হেন সঙ্কটে গোটা দু'য়েক রঙীন খামই ভস্মাধারের কাজ করতো। তাস খেলা শেষ হলে ক্লাবের মালী এসে সতরঞ্চি গুটিয়ে রাখতো। ছাই ঠাসা রঙীন খাম দু'টো ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিত।

অহি আর বন্দনার বিয়ে নিয়ে তর্জন-গর্জন ধিক্কার ভ্রূকুটি—সবই কেন জানি হঠাৎ চাপা পড়ে গেল। অহির বিয়ের রঙীন আবেদনের চিহ্নগুলি চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও ঘটনাটা যেন কারও মনে পড়লো না। অহির বিয়ের মত একটা ঘটনা, একি নিজের তুচ্ছতায় চাপা পড়ে যাচ্ছে? মাত্র ক'দিন আগে যারা এই ব্যাপার নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তারাও যেন আজ ভয় পেয়ে চুপ ক'রে গেছে। বারীন সতু আর শশী এ বিষয়ে কোনো কথাই বলে না। শেষ রঙীন খামটা যেদিন আমাদের তাসের আড্ডা থেকে ভস্মাবশেষ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, সেদিন হঠাৎ আমার একবার কৌতূহল হয়েছিল—অহির বিয়ের দিনটা কবে?

তারপরেই মনে হলো—জেনেই বা কি হবে?

সন্ধ্যের দিকে খুব জোরে বৃষ্টি হয়ে থেমে গেল। ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। তারপর রওনা হলাম। আজই রাত্রে অহির বিয়ে। কেমন ক'রে তারিখটা সঠিক

জানতে পারলাম, জানি না। তবু বুঝলাম পুলিনবাবুর বাড়ির দিকে চলেছি, একা একা, অন্ধকারে, চুপে চুপে।

বরের আসরে বসেছিল অহি। ছোট একটি সামিয়ানা, ওপরে একটি বেলোয়ারী ঝাড়ের আলো জ্বলছে। দু'টি ছোট ছোট কার্পেট পাতা। তার ওপরে বসে আছে জনকয়েক বরযাত্রী—মিউনিসি-প্যালিটির মুন্সি হীরালাল, রামনাথ, পানওয়ালা, অক্ষয় ময়রার ছেলে গোলক আরও ঐ ধরণের ক'য়েকজন। সবাই বেশ ভালোমত সাজগোজ ক'রে এসেছে, বেশ সজ্জনের মত বসে আছে। বড় কৃতার্থ খুশি ও গর্বিত ভাবে বরযাত্রীরা বসেছিল।

আসরের দিকে আর বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারলাম না। আজ আবার অনেক বছর পরে অহির ঘুসি খেয়ে যেন রিং থেকে বাইরে ছিটকে পড়েছি। ঐ রিং-এর ভেতর অহি এখন সর্বেশ্বর। সামিয়ানার নীচে যেন এক ভিন্ন পৃথিবীর শান্ত আলো ফুটে রয়েছে। সেখানে সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে অহি। দক্ষিণী ব্রঞ্জের চিবুক আর কপালের ওপরে চন্দনের ছিটে লেগে রয়েছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে অহিটাকে।

পিঁড়িতে বসিয়ে বন্দনাকে বিয়ের আসরে নিয়ে আসা হলো। বন্দনাও আশ্চর্য করলো। লাল চেলির শাড়ি জড়ানো সলজ্জ ও সন্ত্রস্ত একটা মূর্তি ধনুকের মত বেঁকে রয়েছে। হিন্দুস্থানী পুরুত মন্ত্র পড়লেন। ভীড় নেই, কলরব নেই। আস্তে একবার শাঁখ বাজলো। সকল ভদ্রয়ানার ষড়যন্ত্রের আবর্জনা সরিয়ে পুলিনবাবুর বাড়ির বাগান আর উঠোনের এককোণে আজ একটা নতুন সংসারের রূপ স্পষ্ট ও কঠিন হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের দেবীবর মিশ্র আড়ালে আড়ালে মেল বেঁধে দিচ্ছেন। কাকা আর ক্লাবের সুগম্ভীর সমাজতত্ত্ব এইখানে এসে চরমভাবে ভুয়ো হয়ে গেছে।

হঠাৎ দেখলাম, আমার পাশে কতকগুলি অপরাধী দাঁড়িয়ে

আছে—সতু শশী আর···একে একে সবাই এসেছে। যাক। কিন্তু বারীন কই?

একটু পরেই দেখলাম বারীনও আসছে। আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তবু আমাদের দেখতে পেল না। বিয়ের আসরটার দিকে এক লক্ষ্য রেখে ধীরে এগিয়ে গেল বারীন। একেবারে আসরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হিন্দুস্থানী পুরুত তখন জোর চেঁচিয়ে মন্ত্র আবৃত্তি ক'রে হোম করছিলেন। দেখলাম, বারীন হাঁ ক'রে অহির দিকে তাকিয়ে আছে। বারীনকে দেখতে পেয়ে অহির সারামুখে অদ্ভুত একটা হাসি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বন্দনার মাথাটা আরো হেঁট হয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বারীন উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। দেখলাম, পুলিন-গিন্নীর সঙ্গে বারীন একটা বচসা বাধিয়েছে। পুলিন-গিন্নী হাসছেন। তারপর পুলিনবাবুর কাছে গিয়ে বারীন হাত নেড়ে চেঁচিয়ে যেন একদফা ঝগড়া করলো। পুলিনবাবু হাসতে লাগলেন। পরমুহূর্তে বারীন কোথায় যেন চলে গেল এবং কয়েক মিনিট পরে ফিরে এল। বারীনের সঙ্গে বারীনের জেঠীমা, বারীনের বোন দীপ্তি, বারীনের ভাগ্নী ডলি।

বারীন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। চাকরগুলোকে ধমক দিল। শেষে স্পষ্ট শুনতে পেলাম, পুলিন-গিন্নীর ওপর চটে গিয়ে বারীন গরম গরম কথা বলছে—'ছি ছি, কোনো একটা ব্যবস্থা নেই আপনাদের এ কী রকমের কাণ্ড?'

দেখলাম দীপ্তি আর ডলি একটা ঘর থেকে জিনিসপত্তর টানাটানি করে বের করছে। বাসর ঘর তৈরী করছে। বারীনদের গোমস্তা এক ঝুড়ি ফুল দিয়ে গেল। ঘরের চৌকাঠের কাছে, একটা হ্যাসাক বাতি জ্বালাবার জন্য, খুটখাট ক'রে কাজ করতে বসলো বারীন।

বারীনের কাণ্ডকারখানা দেখে আমাদের সঙ্কোচ কেটে গিয়েছিল। শেষকালে একেবারে প্রকাশ্যভাবেই আসরের কাছে গিয়ে আমরা দেখা দিলাম। বিয়ে তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বারীন আমাদের দেখেই বলে উঠলো—'এই যে, তোমরা তো শুধু গিলতে এসেছো, গিলেই যাও।'

এতক্ষণে সত্যিই একটা বিয়ে বাড়ির কলরব জেগে উঠেছে। অহি আর বন্দনা আমাদের পাশ দিয়েই বাসর ঘরে চলে গেল। সবাই হাসি মুখে ইসারায় অভিনন্দন জানালাম। লজ্জায় ও আনন্দে অহি আমাদের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

বেশ পেট ভরেই গিলে নিলাম আমরা। বারীন তখনও ব্যবস্থা তদারক করছে। পুলিনবাবু সামনে এসে একবার বললেন—'লজ্জা ক'রে খেওনা কিন্তু তোমরা। লুচি-মিষ্টি যত খুশি চেয়ে নেবে।'

আজ তিন বছর পরে পুলিনবাবু হঠাৎ আমাদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেন।

এইবার আমরা বাড়ি ফিরবো। বারীন তখন বাসর ঘরের কাছে ঘুরঘুর করছিল। ডাকলাম বারীনকে।

বারীন সামনে এসে দাঁড়াল। বড় বেশি ক্লান্ত দেখাচ্ছিল বারীনকে। কপালটা ঘেমে আছে, আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে। মাথার উস্কো-খুস্কো চুলের ছায়ায় ওর চোখ দুটো যেন অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করছে।

বারীনকে বললাম—'কি হে, আর কতক্ষণ? চল এবার।'

বারীন সেই মুহূর্তে ঘাবড়ে গিয়ে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লো—'না এখন আমি যাব না। কাজ আছে।'

বারীনের বাড়াবাড়ি দেখে আমরা বিরক্ত বোধ করছিলাম।

হয়তো আর একটু পরেই খুব রেগে উঠতাম, কিন্তু আগে বারীন নিজের থেকেই বেফাঁস বলে ফেললে—'খুব কষে চটাচ্ছি, কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে, প্রত্যেক কথায় শুধু হাসছে।'

সকলে এক সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম—'কাকে চটাচ্ছো? কার কথা বলছো? কে হাসছে?'

হঠাৎ সাবধান হয়ে উঠলো বারীন। সামলে গেল। সেই পুরাতন শ্লথ বিদ্রূপের সুরে, একটু লঘু কুৎসার হাওয়া জাগিয়ে, শুধু কথার চালাকিতে শেষবারের মত আমাদের ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলো—'তোমাদের মিসেস চ্যাটার্জী আবার কে? ফাইন হাসছে কিন্তু, যাই বল।'

আর বলবার কিছু নেই। বারীনকে রেখে আমরা রওনা হলাম। আরও কিছুক্ষণ থাকুক বারীন। আজ যেন ওর অন্তরাত্মা চরমভাবে হেরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছে। আজ বোধ হয় বারীন সত্যিই অ্যানালিসিস ক'রে বুঝতে পেরেছে যে – এই ধরনের মেয়েরা যারা চোখ তুলে তাকাতে পারতো না, ইচ্ছে ক'রেও হাসতে পারতো না, তারা শুধু চায় যে···
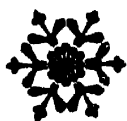
গল্পলোক । নির্বন্ধ

নির্বন্ধ

দামোদর বাঁকের ওপর চিত্রপুর থানা। কত ভদ্রলোক এখানে বেড়াতে এসে বিমুগ্ধ মন্তব্য করেছেন—'এতো থানা নয় এ যে স্যানাটোরিয়াম।' বাস্তবিক চিত্রপুরের জল এত মিঠে, আকাশ এত নীল, বাতাস এত গা-জুড়ানো, এত স্বাস্থ্যপ্রাণ এর রূপালী রোদ।

কেউ বা বলেছেন—'এতো থানা নয় এ যে আশ্রম।' হঠাৎ দেখলে তাই মনে হয়। সুগন্ধ ও সুবর্ণ দেশী বিদেশী ফুলে ভরা থানার বাগান, কাঠগোলাপের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সামান্য বাতাসে গন্ধামোদে ভরে ওঠে। নানা জাতের বাহারে লতা মাচান বেয়ে উঠছে থানাবাড়ির চালের ওপর। টালির চালা ছেয়ে গেছে সবুজ পাতার আস্তরনে।

অনেক নীচে নেমে দামোদর। দু'পাশে গেরুয়া পলিমাটি ছড়িয়ে দামোদরের পাথুরে শিরদাঁড়া এঁকে বেঁকে মিলিয়ে গেছে দক্ষিণের পাহাড়ের ভিড়ে।

দারোগা বিভূতির ছ' বছর হয়ে গেল চিত্রপুরে। এত সুন্দর জায়গাটা, কিন্তু তবুও—ছ' বছর থাকার পর আর মন টেঁকে না। অন্য থানায় বদলী হবার জন্য চেষ্টা করে। তার ওপর রয়েছে আর একজনের তাগিদ—বিভূতির স্ত্রী মায়া। সব চেয়ে বেশি অতিষ্ঠ হয়েছে মায়া। একটানা একঘেয়ে ছ' বছর এক জায়গায় থাকাটাই তার কারণ নয়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এ প্রসঙ্গ নিয়ে ছোটখাট বচসা প্রায়ই হয়।

মায়া বলে—'বদলী হও এখান থেকে।'

বিভূতি—'কোথায় যাবে? মির্জাবাদে? কালাজ্বরে গিলে খাবে।'

মায়া, 'তবুও ভাল। দিন রাত্তির মারধর, 'বাপ্‌রে মারে' আর শুনতে পারি না।'

বিভূতি—'যেখানেই যাও, এ শুনতেই হবে।'

মায়া—'তাহলে আমায় পাঠিয়ে দাও ধানবাদ, বাবার কাছে।'

বিভূতি এবার ভাল করে তর্কের জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয়।—'বাবার সঙ্গে হাসপাতালের কোয়ার্টারে এতদিন ছিলে কি করে, যেখানে যখন তখন মানুষ চেড়াফাড়া চলেছে? সেখানে বাপরে মারে নেই?'

মায়া—'কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা? সেখানে মানুষের ভালোর জন্যে রোগ সারাবার জন্যে চিকিৎসা হয়। সে বাপরে মারে অন্য রকম!'

বিভূতি—'এখানে বুঝি রোগ বাড়ানো হয়? গুঁতোগুঁতি এমনিতে দেখতে বড় খারাপ, কিন্তু কেসগুলো কেমন চটপট পরিষ্কার হয়ে যায়। এটা থানা, বজ্জাতি সারানো হয় এখানে। তোমার হাসপাতাল এমন কিছু স্বর্গ নয়।'

মায়া—'আইনে যখন আসামীকে মারধর করার নিয়ম নেই, তখন তোমার অত মাথা ব্যথা কেন?'

বিভূতি—'তা জানি। রাত্তিরে যে আসামীদের জন্য খিচুড়ি রেঁধে দিলে, সেটাও আইনে নেই। এ'রকম দু'চারটে আটপৌরে আইন তৈরী ক'রে নিতে হয়। নইলে থানা চালানো আর চলে না।

মায়া—'বেশ, এবার থেকে খিচুড়ি রেঁধ তুমি। আমার দ্বারা নিত্য ও ঝঞ্ঝাট সহ্য করা আর চলবে না। সরকার আমায় মাইনে দেয় না, আমি পেন্সনও পাব না।'

দারোগা বিভূতি, ছোট দারোগা ও বড় জমাদার—চিত্রপুর থানার

প্রায় সকলেরই মন চিত্রপুরের ওপর অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। আকর্ষণ শুধু এর জলহাওয়াটুকু। নইলে এই এলাকাটা যত রকম চুরি, বজ্জাতি খুন-খারাপির আড়ত বিশেষ। দিনরাত তদন্ত, তল্লাস, গ্রেপ্তার আর চালান নিয়ে উগ্র রকমের ব্যস্ততা। সাধারণ মানুষের মত বেঁচে থাকার আনন্দ লোপ পেতে বসেছে। সকাল সন্ধ্যা মূর্তিমান পেনাল কোডের মত এই উর্দিভূষিত জীবন। বদলীর জন্যে প্রত্যেকেই ছটফট করে।

কিন্তু একেবারে নির্বিকার ছোট জমাদার কড়ে খাঁ। থানাবাড়ি যখন প্রথম তৈরী হয় তখন থেকে কড়ে খাঁ এখানে—সে আজ পনের বছরও হতে পারে। ওর মুখে আজও কোনো আক্ষেপ শোনা যায় না। ওর বদলী হবারই বা কি প্রয়োজন? পেন্সন নিয়ে চলে যাওয়াই উচিত। বেশ বুড়ো হয়েছে।

কড়ে খাঁ বলে, 'যাব কেন? বাঘ চলে গেলে জঙ্গলে আর রইল কে?'

ছোট জমাদারের 'কড়ে খাঁ' নামটি কার দেওয়া সেটা আজ আর সঠিক জানা যায় না। সই করবার সময় লেখে আলি আকবর খাঁ। কিন্তু এ নাম বললে বিভূতিও চট করে বুঝতে পারবে না, লোকটা কে? কিন্তু বলা হোক—কড়ে খাঁ। সদরের পুলিশ মহল থেকে শুরু করে চিত্রপুর এলাকায় যত গাঁ, গঞ্জ, আর বস্তির ছেলে বুড়ো প্রত্যেকে চিনে ফেলবে—ছোট জমাদার।

কড়ে খাঁ রহিলা পাঠান। বুড়ো মানুষ। প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি কোনো হাফিজ সাহেবের মত ধর্মপ্রাণ চেহারা। দাড়িতে মেদি পাতার রঙের ছোপ ফিকে বাদামী হয়ে এসেছে। পাকা ভুরু। লালচে গায়ের রঙ এত বয়সেও ময়লা হয় নি। তবে চামড়া কুঁচকে গেছে, শ্লথ হয়ে গেছে মাংসপেশী। তবুও কড়ে খাঁ সোজা হয়েই চলে,

লাফালাফি করতে কোনো জোয়ানের চেয়ে কম যায় না—সে শুধু পেটাই করা লোহার মত হাড্ডির জোরে। এই জীর্ণ খাপের ভেতর ক্রূরতার যে ছুরি লুকিয়ে আছে, তার ধার আজও কমে নি।

চিত্রপুরের শিশুরা দেব দানব ভূত প্রেতের উপকথার মত ঠাকুরমার মুখে শুনেছে কড়ে খাঁ সাঁড়াসি তাতিয়ে জিভ টেনে ধরে, আলকাতরা মাখিয়ে গাছে ঝুলিয়ে তলায় আগুনের ধুনি জ্বেলে দেয়। লোকের গলায় বাঁশ চেপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচে, মুখে থুথু দেয়। কাস্তে দিয়ে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে হাত কেটে নেয়—যত রক্ত ঝরে তত হাসে।

এই হলো কড়ে খাঁ—বড্ড কড়া—ক্রূর!

অরণ্যরাজ্য জুড়ে চিত্রপুর এলাকা। সড়কের ওপরে চিত্রপুরের গঞ্জ। সব চেয়ে বড় বাড়িটা—আধুনিক ঢঙের যেটা—চিত্রপুরের টিকাইত ধনঞ্জয় গোঁসাইয়ের। গোঁসাই শুধু জমিদার নয়, ব্যবসায়ীও। ঐ যে সেগুন কাঠের ইয়ার্ড, পঞ্চাশটা করাত চলছে—সেটা গোঁসাইয়ের। মাঠের ওপর যতগুলি পাঁজায় ইট পুড়ছে, যতগুলি ভাঁটায় চুণের ঘুটিং পুড়ছে, ওসব গোঁসাইয়ের। গঞ্জের এত বড় গালার কারখানাটা, সেটারও মালিক গোঁসাই। গোঁসাইয়ের এক পুরুষেই আমলকীর জঙ্গলে এত ঐশ্বর্য গজিয়ে উঠলো কি ক'রে? ব্যবসায়ী বুদ্ধি ও ফৌজদারী প্রতিভা একই আধারে আশ্রয় নিলে যা হয় তাই হয়েছে। অন্য সরিকের গোঁসাইরাও তো রয়েছে, তাদের ঘরের মাটির দেয়াল এক বর্ষায় ধ্বসে গেলে এক পুরুষেও আর সারানো হয় না।

চিত্রপুরের বস্তিতে থাকে দোসাদেরা আর ডিহিগুলোতে মুণ্ডা। আদ্ধেক চিত্রপুরী গোঁসাইয়ের খামারে খাটে, বাকী আদ্ধেক গোঁসাইর

জমি চষে আধবাট্টায়। যে যার সামর্থ্য মত কুলগাছে কিছু কিছু লাক্ষাগুটি ফলায়। বেচতে হয় সবাইকে গোঁসাইয়ের গদিতে। সারা চিত্রপুরে হেন মুণ্ডা দোসাদ নেই যে টিকাইত গোঁসাইয়ের কবলায় বাঁধা নয়।

চিত্রপুরের ছেলেবুড়ো ভয় খায় থানাকে – যে থানায় কড়ে খাঁর মত নরসিংহ বিরাজমান। আর চিত্রপুরের থানা ভয় খায় টিকাইত ধনঞ্জয় গোঁসাইকে। সদরের উকীল মহল থেকে শুরু করে মার্চেন্ট ও অফিসার মহল পর্যন্ত গোঁসাইয়ের গতিবিধি অবারিত—সর্বত্র খাতির আর আপ্যায়ন। যে কোনো উদ্যোগে চাঁদার খাতায় গোঁসাইয়ের সই পড়ে মোটা অঙ্কের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে। গুনে গুনে দেড় হাজার ভোট খেলে গোঁসাইয়ের পাঞ্জায়। ইলেকসনের লড়াইয়ে যার দিকে চলে গোঁসাই, তারই ভাগ্য প্রসন্ন হয়। দেড় হাজার হাতি পুষলেও এখন আর এতটা প্রতিপত্তি কেউ পায় না—এটা গণতন্ত্রের যুগ।

প্রথম প্রথম এসে বিভূতি তার অফিসারি স্পর্ধা নিয়েই চলতে শুরু করেছিল। গোঁসাইয়ের মাত্র দু' একটি প্যাঁচের দাপটে সে স্পর্ধা নুইয়ে এল মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত। গোঁসাই এ পর্যন্ত চারজন দারোগার চাকরী খেয়েছে। গোঁসাইয়ের নতুন মোটর গাড়ির চাকাটার দিকে তাকিয়ে বিভূতি নিজেকে শান্ত করে আনে—অসম্ভব নয়, ঐ চোদ্দ-হাজারী গাড়ির চাকার তলায় নব্বই টাকার দারোগা-গিরি গুঁড়ো হয়ে যেতে কতক্ষণ ?

টিকাইত গোঁসাইয়ের কথা মনে পড়লেই বিভূতির যেন যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। সমস্ত অন্তর দিয়ে সে তখন বদলী প্রার্থনা করে। মাছ ধরার সখ ছিল। গোঁসাইয়ের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে যে সব কথা শুনে সে ফিরে এসেছে—তার চেয়ে জংলীদের বিষমাখা

তীরের আঘাত ভাল। গা থেকে ইউনিফর্ম খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। এমন দারোগাই ছেড়ে দিয়ে টোলের পণ্ডিতী ধরাই উচিত।

কড়ে খাঁ হেসে হেসে বলে, 'শেখো দারোগাজী, শেখো। আমি আজ পনের বছর ধরে দেখে আসছি। দেখি আর কতদিন। পেন্সন নেব না হুজুর—জিন্দিগি পর্যন্ত দেখবো, এই বেইজ্জতির মার কতদিন চলে, কবে ইনসাফ হয়।'

সকাল বেলায় থানার বারান্দায় চৌকিদারেরা হরেক রকমের আসামী নিয়ে বসে আছে। বিভূতি ডায়েরী আর রিপোর্ট লিখছে। চিত্রপুর থানা চালানো সোজা ব্যাপার নয়। অনেক দারোগা এখান থেকে চরম দুর্গতি নিয়ে ফিরেছে। তবে ছোট জমাদার কড়ে খাঁ যতক্ষণ আছে, কাজ এক রকম চলে যাবেই। অন্তত অপরাধ কবুল ও অপরাধী ধরা পড়বেই। চুরি, দাঙ্গা, ডাকাতি, খুন, ডাইনী-পোড়ানো, নরবলি, বিষ খাওয়ানো বা মদচোলাই—প্রত্যেক কেস অতি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ সহ ধরা পড়ে যায়। এর মূলে ছোট জমাদার কড়ে খাঁ—তার হাতের মারের মহিমা। কড়ে খাঁর মারে কবুল করবে না এমন দাগী আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি।

কড়ে খাঁ প্রায়ই আপসোস করে বলে, 'আরে আমার এক চড়ে বড় বড় শের বাপের নাম বলে দেয়, কিন্তু কোনো ব্যাটা আসামী কি বিনা মারে কবুল করলো? আমার হাতের মার খেতে নিশ্চয় ওদের ভাল লাগে।'

চৌকীদারেরা একে একে রিপোর্ট লেখালো। বিভূতি ডাকলো, 'কড়ে খাঁ!'

টুলের ওপর বসে বসে কড়ে খাঁ ঝিমোচ্ছিল, বিভূতির ডাকে উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলে একবার দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিল। তারপর

নির্লিপ্তভাবে মুঠো করে ধরলো তার মোটা সিঙ্গাপুরী বেতের লাঠিটা।

বিভূতি কতবার বলেছে, 'কড়ে খাঁ, রিপোর্টগুলো একবার কান দিয়ে শুনে নিও আগে, তারপর যাকে যেমন উচিত তেমনি মারধর করো।"

'— যা মাইনে, তাতে অত মেহন্নত আর দেমাক খরচ পোষায় না হুজুর। রিপোর্ট আবার কি শুনবো। সব শালা চোর।'

কবুল করবার সময় বিভূতি একটু সতর্ক থাকে। কড়ে খাঁর মাত্রাজ্ঞান নেই। মুর্গী চোর বা খুনের আসামী দুজনকেই কড়ে খাঁ সমানভাবে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে। তার কারণ, কার কি অপরাধ সে খোঁজ সে রাখে না।

বিভূতি ডাকলো, 'কড়ে খাঁ।'

কবুল করাতে হবে।

আসামী একটা ঢ্যাঙা গোছের দোসাদ ছোঁড়া। রূপোর হুঁকো চুরি করেছে। দোষ স্বীকার করছে না, চোরাই মালের হদিসও দিচ্ছে না।

দোসাদ ছোঁড়াটাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার কড়ে খাঁ তার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিল। ছোঁড়াটা খুব রোগা, তবে হাড়গুলো মজবুত। খালি গা, বড় বড় চুল, গলায় একটা কুঁচের মালা। একটা নোংরা গামছা কোমরে জড়ানো, ট্যাকে একটা খৈনির ডিবে।

কবুল করাবার আগে কড়ে খাঁ কতগুলি প্রক্রিয়া পালন করতো, রাগের গ্যাস চড়িয়ে নেবার জন্য। ছোঁড়াটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে

থেকে কড়ে খাঁ দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'হুঁ, বুঝেছি, এ শালা দেখছি একটা সাপ, বিলকুল সাপ!'

সপাং—কোমরের ওপর পড়লো কড়ে খাঁর সিঙ্গাপুরী বেতের বাড়ি। কোথায় গেল বৃদ্ধ আলি আকবর খাঁর সেই প্রশান্ত সৌম্য হাফিজ সাহেবের মূর্তি! একটা কেশরফোলা রুষ্ট সিংহ যেন শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়েছে। নিজেকে অনুপ্রাণিত করার জন্য যেন কড়ে খাঁ মাঝে মাঝে হুংকার ছাড়ছে, 'মারো, শালা সাপকো মারো!'

ছোঁড়াটা দোষ কবুল করে ফেলেছে, মাল কোথায় আছে তাও বলে দিয়েছে। কড়ে খাঁর বেতের বিদ্যুৎস্ফূর্তি শান্ত হয়ে এল।

আর একজন আসামী—বুধু ওঁরাও। বারান্দার মেঝের ওপরে ঠকাস্ করে মাথাটা ঠুকে, বুকে হাত দিয়ে বললো, 'ভগবান জানে হুজুর, আমি ওদের শুয়োর চুরি করে খাই নাই।'

বিভূতি ডাকলো, 'কড়ে খাঁ।'

বুধু ওঁরাও আদুড় গা, সমস্ত শরীরে কালো কালো কুঁদো কুঁদো মাংসের চাপ। মাথার বাবরী চুলে একটা চিরুণি গোঁজা, হাতে কাঁসার বালা, ঝকঝকে সাদা দাঁত।

'—এ শালা ভালুক, বিলকুল ভালুক। মারো শালা ভালুককো!' কড়ে খাঁ বেত হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো বুধু ওঁরাওয়ের ওপর। দুমিনিটেই স্পষ্ট কবুল আদায় হয়ে গেল।

বিকেলের দিকে থানার ফটকে শোনা গেল গোঁসাইয়ের মোটরের হর্ন। চোকীদারদের মধ্যে একটু ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেল। বিভূতি মুখে হাসি টেনে কিছুদূর এগিয়ে গোঁসাইকে অভ্যর্থনা করলো,

'আসুন, আজকাল যে এদিকে একবার ভুলেও আসেন না। আশ্রিত-জনকে এ উপেক্ষা কেন?'

'—বড় নাম খারাপ করছো বিভূতিবাবু।' গোঁসাই বিভূতির তোষামোদের কোনো প্রশ্রয় না দিয়েই বললো। বিভূতিকে নিরুত্তর দেখে নিজেই আবার প্রসঙ্গ টেনে চললো,—'শুধু মুর্গীচোর ঠেঙিয়ে থানা চালানো যায় না। সেই গ্যাংটা কাল আবার আমার দু' গাড়ী গুড় লুট করেছে। চিত্রপুরের দারোগাগিরি চেয়ারে বসে হয় না। বাইরে বের হতে হয়।'

গোঁসাইয়ের দৃষ্টি পড়লো কড়ে খাঁর দিকে। কড়ে খাঁ তার নিজেরই চোখ দুটো নামিয়ে নিল। এতক্ষণ সে শুধু দেখছিল গোঁসাইকে ক্রূর লুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে।

গোঁসাই বললো, 'কি বুড়ো, একটা আদাব বন্দেগী করাও ভুলে গেছ দেখছি।'

কড়ে খাঁ ভ্যাবাচাকা খেয়ে জানালো, 'বন্দেগী হুজুর!'

তারপর হুকুম হলো, 'বিভূতিবাবু, ও গ্যাংটার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলো, এস-পি জিজ্ঞাসা করলে যাতে আমি জবাব দিতে পারি। আর—এই বুড়ো, তুমি এবার পেন্সন নাও বাবা, শুধু বসে বসে লাঠিবাজি আর চলবে না।"

ফটক পর্যন্ত এসে নমস্কার জানিয়ে বিভূতি গোঁসাইকে বিদায় দিল।

সন্ধ্যেয় থানাবাড়ি একটু নিঝুম হয়। বারান্দায় টিমটিম করে একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলে। বিভূতি একবার চারিদিক ঘুরে ফিরে তার দিনের প্রোগ্রাম শেষ করে।

কড়ে খাঁর নমাজ পড়া শেষ হয়। রুটি তৈরী করে। খাওয়া শেষ করে বারান্দায় একটা কম্বলের আসন পেতে বসে। চৌকীদারেরা উনুন জ্বেলে ভাত চড়ায়। গল্প আলাপ আরম্ভ হয়।

কড়ে খাঁ চোখ বুজে শোনে চিত্রপুরের দুরন্ত দুঃখের ইতিহাস। চৌকিদারেরা মন খুলে সব কথাই আলোচনা করে। '—সবই তো জানি। গুড় লুট করেছে কারা, তাও জানি। মুণ্ডাদের কাজ। কেন করবে না জমাদার সাহেব? বড়দিনের সময় একমাস ধরে ওরা শুধু জঙ্গল ঝালোয়া করেছে। টিকাইতজী যত অফিসারের ছেলে নিয়ে শিকার ফুর্তি করেছে। মজুরী এক সের ছাতুও পায় নি মুণ্ডারা।'

ডোমন চৌকীদার বলে, 'দোসাদেরা সাত দিন ধরে টিকাইতজীর একটা জঙ্গল কেটেছে। ঘোড়ার মত খেটেছে বেচারারা। এক পয়সা নগদ মজুরী পায় নি। সব কবলার সুদ বাবদ কাটিয়ে দিয়েছে।'

'ইয়া আল্লাহ্'—একটা হাই তুলে নিয়ে কড়ে খাঁ যেন ধমক দিল।—'আরে ছাড় ও-সব কথা। একদিন এর বিচার হয়ে যাবে।'

নান্থু চৌকিদার বললে, 'তুমিও আজব মানুষ জমাদার সাহেব। বুড়ো হয়েছ, আর কেন? এবার পেন্সন নিয়ে বাড়ি যাও। এখন আর কি? তোমার তো শুধু মাটি নেওয়া বাকী আছে। তা নয়, এখানে বসে আসামী নিয়ে শুধু মারধর আর কাটাকাটি!'

কড়ে খাঁ রেগে উঠল, 'উল্লু নেহি তো। আমি বুড়ো, আর এইসব জোয়ানদের চেহারা দেখ। কাউয়াভি দেখে ভয় পায় না। হায়!'

কড়ে খাঁর উষ্মায় চৌকীদারদের মধ্যে হাসির সোর পড়ে গেল। ডোমন বললে—'ছোট জমাদারের মেজাজই এই রকম, পেন্সনের কথা বললেই বিগড়ে ওঠে।'

লণ্ঠন নিয়ে বিভূতি একবার হাজত ঘরটা ঘুরে গেল। এর পর ঘরে ফিরে তাকে আরও একটা পরীক্ষা পার হতে হয়। এ পরীক্ষায় একমাত্র গতি মায়া।

মায়া বিছানা ছেড়ে উঠতে চায় না, 'যাও, আসামীদের ওপর অত দয়াধর্ম যদি দেখাতে হয় তবে যাও তোমার সাকরেদ কড়ে খাঁর কাছে। ওই মাঝরাত্তিরে উঠে রোজ খিচুড়ি রেঁধে দেবে।'

এসব অভিযোগের উত্তরে বিভূতির মুখে এ সময় নিছক সকরুণ অনুনয়ের ভাষা ছাড়া আর কিছু বার হয় না। একটানা মিনতির পালা চলে—'দাও, দাও লক্ষ্মীটি। সেই কাল বিকেলে সদরে পৌঁছে তবে ব্যাটারা খেতে পাবে। শুধু চালেডালে একটু ফুটিয়ে দাও। তা হলেই হবে।'

শেষ পর্যন্ত কিন্তু মায়াকে উঠতেই হয়, রাত দুপুরে হাঁড়ি ঠেলে খিচুড়িও রাঁধতে হয়।

চিত্রপুর থানার এই একটি চিত্র। আজ ছ'বছর ধরে চিত্রপুরের দারোগাপদে সমাসীন বিভূতি এই অভিনয়ে অভ্যস্ত হয়েছে। ক্লান্তি তেমন হয় নি, তার চেয়ে গ্লানিই বেশি। বদলী হতে ইচ্ছে করে, এখনি পেন্সনের সম্ভাবনা থাকলে আরও ভাল হত। কিন্তু ছোট জমাদার কড়ে খাঁ—নিত্যদিনের এই সংহারধর্ম যেন তার সত্তার সঙ্গে মিশে গেছে। বয়সে বুড়ো হয়েও লোকটা এখনও একটুও কাবু হয় নি। পেন্সন নেবার কথাও বোধ হয় সে ভুলে গেছে।

মায়া সকালে উঠে জানালা খুলেই কৌতূহলী চোখ দুটো আরও বড় বড় করে তাকিয়ে দেখলো। ছোট দারোগা বন্দুক কাঁধে ফিরছে, সঙ্গে গোটাকয়েক চৌকীদার আর সেপাই। সঙ্গে আসামীও আছে—একটি যুবতী মেয়ে, ছেঁড়া খাটো কাপড়ে শরীর ঢাকা, গলায় একটা

গিলে আর ভেলার মালা। আরও আছে, বছর আটেকের একটা ছেলে ও গোটা দশেক গাঁজার চারা আর মদ চোলায়ের হাঁড়ি। মায়া নিবিষ্ট দৃষ্টি দিয়ে আর একবার মেয়েটাকে দেখে নিয়ে ষ্টোভ ধরাতে চলে গেল।

চা খেয়ে ইউনিফর্ম চড়িয়ে বিভূতি বাইরে যাবার উত্যোগ করতেই মায়া বললো, 'শোন, আজ যে আসামী এসেছে, তাকে কিন্তু মারধর করতে পারবে না, সাবধান!'

বিভূতি, 'সকাল সকাল আবার কি আরম্ভ করলে? আজ একজন গ্যাংএর আসামী এসেছে, লাই দিলে কেস ফেঁসে যাবে। আমার চাকরীর দফা সেরে দেবে গোঁসাই।'

মায়া—'আমি দিব্যি দিলাম, আসামীর গায়ে হাত তুলো না, আসামী পোয়াতি মানুষ।'

বিভূতি দরজার বাইরে পা বাড়াতেই মায়া আবার কি বললে। বিভূতি মুখ ঘুরিয়ে তর্জন করে উঠলো, 'চোপ রও, ডোণ্ট···'

উর্দি গায়ে চড়ালেই বিভূতির মুখে ইংরেজী ফুটে ওঠে।

মায়া ব্যর্থ রোষে লাল মুখে একবার বললে, 'আচ্ছা।'

তারপর নিষ্ফল অভিমানে বিছানায় গিয়ে লুটিয়ে পড়লো। সশব্দে বন্ধ করে দিলে জানালাটা, থানার বারান্দাটা যেন চোখে না পড়ে। পেয়ালার চা কিছুক্ষণ বাষ্প ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মাঝরাত্রে। খুব বড় রকম একটা বর্ষণ হয়ে সবে মাত্র থেমেছে। দামোদরে জেগে উঠেছে সুস্বন কলরোল। শত শত ঝরনা জঙ্গলের ভেতর হঠাৎ মুখর হয়ে উঠেছে।

থানার ফটক ডিঙিয়ে একটা লোক চীৎকার করে দৌড়ে এল। বিভূতি, কড়ে খাঁ, ছোট দারোগা আর চৌকিদারেরা ঘুম ছেড়ে বারান্দায় এসে জমা হলো।

হন্তদন্ত হয়ে বিভূতি ঘরে এসে ঢুকলে একবার। মায়ার ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার বেল্ট আর রিভল্‌ভারটা দাও শীগ্‌গির। তুমি দরজা বন্ধ করে রাতটুকু জেগেই কাটিয়ে দাও। আমি আসছি।'

অন্ধকারে থানার পুলিশদল এগিয়ে চললো চিত্রপুরের গঞ্জের দিকে। টিকাইত গোঁসাইয়ের বাড়ির কাছে এসে তারা থামল।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ির ভেতর থেকে বিভূতি আর ছোট দারোগা ফিরে এল। সঙ্গে আসামী চিত্রপুরের বিধাতা ধনঞ্জয় গোঁসাই।

গোঁসাই একবার বললো, 'বুঝে কাজ করছো তো বিভূতিবাবু?'

বিভূতির কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হলো ছোট্ট একটি শব্দ, 'ইয়েস্‌!' সে আজ যেন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করছে—সত্যিই সে দারোগা।

গোঁসাই তার কেরাণীবাবুকে ডেকে বললেন, 'সব দেখলে তো? গাড়ি বের করো। ভোরেই সদরে চলে যাও। আমি চললাম বিভূতিবাবুর অতিথি হয়ে।' গোঁসাইজীর ঠোঁটে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো।

ভোর হয়েছে, থানার ফটকের বাইরে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। খুনের আসামী টিকাইত ধনঞ্জয় গোঁসাই বসে আছে বিভূতির সামনে টুলের ওপর। বিভূতির ফার্ষ্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট লেখা হয়ে গেছে। ছোট হিস্যার গোঁসাই যেমন গরীব, তার বউ তেমনি সুন্দরী। তাকে খুন করেছে ধনঞ্জয়। লাস গুম করা হয়েছে, এখনও পাত্তা হয় নি।

বিভূতি কলম ধরলো গোঁসাইয়ের ষ্টেটমেণ্ট লিখতে। কড়ে খাঁ এরই মধ্যে দু'বার নমাজ সেরেছে। তার বহুদিনের বন্ধু পুরানো

টুলটার ওপরে গিয়ে বসলো দূর বারান্দার কোণে। কড়ে খাঁ আজ ঝিমুতে পারছে না। মোটা সিঙ্গাপুরী বেতের লাঠিটা হাতের গোড়ায় টেনে রেখে আকাশের দিকে ঘোলাটে চোখের স্থিরদৃষ্টি তুলে বসে আছে। বহু প্রতীক্ষার, বহু কামনার এক দূর স্বপ্নছবি আজ মূর্ত হয়ে উঠেছে সম্মুখে।

গোঁসাই বললে, 'ষ্টেটমেণ্ট আমি যা দেব, তাই লিখবে তো বিভূতিবাবু ?'

বিভূতি—'গো অন্।'

গোঁসাই, 'ছোট হিস্যার গোঁসাইয়ের বউকে খুন করেছে, দারোগা বিভূতি বোস, লাস গুম করেছে দারোগা বিভূতি বোস··· ।'

গলার স্বর নামিয়ে গোঁসাই বললে, 'যা বলছি বিভূতিবাবু, সবই বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়ে যাবে। তুমি এ-কথা অবিশ্বাস করো ?'

নির্বোধ বিস্ময়ে বিভূতি গোঁসাইয়ের দিকে তাকালো। গোঁসাইয়ের বিদ্রূপের হাসির জ্বালায় ধীরে ধীরে বিভূতির চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে এল ভীরুতার প্রতিবিম্বের মত।

গোঁসাই বললে, 'শোন বিভূতিবাবু, সোজা কথা, সোজা রাস্তা। নগদ নগদ দিয়ে দিচ্ছি, দু'হাত ভরেই দিচ্ছি। রাজি হও তো বলো, নইলে কেরাণীবাবু চললো সদরে। তোমার আমার লড়াইয়ে কে জিতবে, এ-বিষয়ে কি তোমার কোনো ধারণা নেই ?'

বিভূতি মুখ নামালো, কলমও নামিয়ে রাখলো। গোঁসাই উৎসাহ দিয়ে বললে, 'বাস্. এবার কাউকে ডাকো। কেরাণীবাবুকে খবর দিক যে সদরে যেতে হবে না। একটু তাড়াতাড়িই কাউকে পাঠাও, নইলে ওদের গাড়ি বেরিয়ে যাবে।'

অনেকক্ষণ পার হয়েছে। বুড়ো কড়ে খাঁর গায়ে যেন জ্বরের জ্বালা ধরেছে। দারোগাবাবু করছে কি এতক্ষণ ধরে ? কি এত

কলমবাজি ? কেরামতের দিন আজ। সত্যিই সে বুড়ো হয় নি। তার স্থবির শরীরের শিরা উপশিরায় এতদিন ধরে সে লালন করে এসেছে ঐ প্রখর সংহার তৃষ্ণাকে—এই পরম লগ্নে আজ তার মহানির্বাণ হবে।

বিভূতি ডাকলে, 'কড়ে খাঁ!'

এই সেই আহ্বান, যার জন্যে কড়ে খাঁর যৌবনের ধার ছুরির মত ঐ জীর্ণ খাপে এতদিন অটুট হয়ে আছে। সমস্ত চিত্রপুরের রক্তাক্ত বেদনার রূপ তারই ক্রূরতার ভেতর এই দীর্ঘ দিন ধরে প্রতিমূর্ত হয়ে এসেছে। তারই পরিসমাপ্তি আসন্ন। কবুল করাবার আনন্দের আস্বাদ আজ চরম হয়ে উঠবে।

সিঙ্গাপুরী বেতের লাঠি হাতে তুলে এগুলো কড়ে খাঁ। বিভূতি একটা চিঠি তুলে বললে, 'কড়ে খাঁ, একটু তাড়াতাড়ি দৌড়ে যাও। গোঁসাইজীর কেরাণীবাবুর হাতে দিও।'

কাঁপতে কাঁপতে চিঠিটা নিয়ে কড়ে খাঁ নেমে এল বারান্দা থেকে। একটা চৌকীদারের ওপর এই কাজের ভার চাপিয়ে দিয়ে কড়ে খাঁ বারান্দার কোণে টুলের ওপর এসে বসে পড়লো।

অলস অবসন্ন কড়ে খাঁ স্থির হয়ে বারান্দার কোণে বসে ছিল। বাদামী দাড়ির গুচ্ছ ফুর ফুর করে উড়ছে বাতাসে। পাকা ভুরু দু'টো ঝুলে পড়েছে চোখের কোটরের ওপর।

বিভূতি একবার উঠে দাঁড়ালো। চোখ দুটো বাষ্পায়িত আকাশের মত ম্লান। বিভূতির মনে হলো, কড়ে খাঁ এইবার সত্যিই পেন্সন নেবে। ও শরীরে আর শক্তি সামর্থ্যের কোনো নিশানা নেই। জরাগ্রস্ত, লোলচর্ম বিগলিতপেশী এক অশীতিপর বৃদ্ধের শব কুঁকড়ে পড়ে আছে বারান্দার কোণে।

গল্পলোক | কতটুকু ক্ষতি

কতটুকু ক্ষতি

আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেন হন্তদন্ত হয়ে স্বাক্ষর পত্রিকার অফিসে ঢুকলো। শ্রীমন্তের মুখের দিকে তাকিয়েই সম্পাদক অক্ষয়বাবু বুঝলেন--পর্ব্বতো বহ্নিমান্। এই রুচিমান শিল্পীর নিষ্ঠার পর্বতে কোন্ বহ্নির স্পর্শ দাবানল সৃষ্টি করেছে, অভিজ্ঞ সম্পাদক অক্ষয়-বাবুর কাছে সে রহস্য অজানা ছিল না। আর্টিস্ট শ্রীমন্তকে তিনি আজ চার বছর ধরে এই মূর্তিতেই দেখে আসছেন। মিষ্টি কথার বর্ষা নামিয়ে এই উত্তপ্ত মূর্তিকে কি ভাবে ঠাণ্ডা করে দিতে পারা যায়, সেই কৌশল তাঁর কাছে চার বছরের নিয়মিত চর্চায় এখন নিছক একটা অবলীলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট যতই রাগে গর্জন করুক, ভয় দেখাক, অনুরোধ করুক—সম্পাদক অক্ষয়বাবু বিচলিত হন না কিছুতেই। কিন্তু আর্টিস্ট শ্রীমন্ত এত বিচলিত হন কেন? কেন আজ চার বছর ধরে একটা বিক্ষোভের ঝড়ে তার মনের শান্তি বিপর্যস্ত হয়ে আছে?

শ্রীমন্ত আর্টিস্টের বিদ্রোহী মূর্তিটা একটা চেয়ারের ওপর ধপ্ করে বসে পড়েই সম্পাদক অক্ষয়বাবুকে যেন চ্যালেঞ্জ করলো।—'আবার আপনি ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্তর তোলা একটা লক্কড় ফটো ছেপেছেন! বিজয় ফটোগ্রাফারের এলবামটাকে যদি আপনি একটা রত্নদীপ মনে করে থাকেন, তবে তাই করুন; কিন্তু আমাদের বাদ দিন। প্রতি মাসে ঐ এলবাম থেকে এক একটি ঘুঁটে পোড়ানো রত্ন দিয়ে আপনার স্বাক্ষরকে সাজিয়ে বার করুন। আর্টিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিন। বাস্—স্বাক্ষরকে যদি রাখতে হয়, তবে এক

নৌকায় পা দিতে শিখুন। তেলে-জলে মেশাবার চেষ্টা করবেন না। হয় আর্টিস্ট নয় ফটোগ্রাফার—এর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। বলুন।'

উত্তরে সম্পাদক অক্ষয়বাবু মৃদু হেসে যথাসৌজন্যে শুধু সিগারেটের ডিবেটি শ্রীমন্তের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন—'আসুন।'

একটা সিগারেট অবশ্য তুলে নিল শ্রীমন্ত, কিন্তু অক্ষয়বাবুকে প্রসঙ্গ থেকে সহজে রেহাই দিল না—'না অক্ষয়বাবু, আমি স্পষ্ট করে জানতে চাই আপনার উদ্দেশ্য কি?'

উদ্দেশ্য? অক্ষয়বাবু তাঁর সম্পাদকীয় জীবনে এই প্রথম একটা অদ্ভুত কথা শুনলেন। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট যেন একটা প্রচণ্ড ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছে। উদ্দেশ্য? সম্পাদকের উদ্দেশ্য? পত্রিকার উদ্দেশ্য? আজ চার বছর ধরে স্বাক্ষরের মত বাংলা পত্রিকার অন্তর্লোকে আনাগোনা করেও যে-মানুষ এখনো পত্রিকার উদ্দেশ্য জানবার কৌতূহল রাখে, তার জন্য কার না দুঃখ হয়? সত্যি, শ্রীমন্তের জন্য বড় দুঃখে হাসছিলেন অক্ষয়বাবু।

শ্রীমন্ত বললো—'সমাজ সাহিত্য ও শিল্প প্রচারের পবিত্র দায়িত্ব নিয়েছেন, অথচ একটা নীতি, একটা লক্ষ্য, একটা রুচি…'

একটা সমবেদনার উচ্ছ্বাসেই বাধা দিয়ে অক্ষয়বাবু বললেন—'আছে আছে, সব আছে শ্রীমন্তবাবু।'

শ্রীমন্ত—'ফটোর নীচে আবার লিখে দিয়েছেন—ফটোশিল্পী বিজয় গুপ্ত। ছি ছি, কী ভাল্‌গারিজ্‌ম্ মশাই। ফটোগ্রাফার হলো শিল্পী। আরশুলা হলো পক্ষী? কুত্তার নাম বাঘা? কানার নাম পদ্মলোচন? মোষের নাম মহাশয়?'

অক্ষয়বাবু—'চা খাবেন? তার সঙ্গে টোস্ট? মরিচ দিয়ে? কেমন?'

বঙ্কিমান্ শ্রীমন্ত একটু স্তিমিত হয়ে এল। অনুযোগের সুরে বললো—'না, এ-সব বড় অন্যায় করছেন অক্ষয়বাবু। না দেখছেন পত্রিকার প্রেস্টিজ, না দেখছেন আমাদের মানসম্মান! কী পদার্থ আছে ঐ ফটোতে! বিজয় গুপ্তের তোলা ফটো, তার নাম আবার—'ফাগুন লেগেছে বনে বনে'। হাসালেন অক্ষয়বাবু।'

অক্ষয়বাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—'অবশ্য আপনাকে জানাতে বাধা নেই, ঐ ফটোটার খুব ডিম্যাণ্ড হয়েছে। নিউ-ইয়র্কের একটা পত্রিকার প্রতিনিধি আজই এসে ফটোগ্রাফারের ঠিকানা নিয়ে গেছে—ওরাও ফটোটা ছাপাতে চায়।'

শ্রীমন্ত বিদ্রূপের ভঙ্গীতে উল্লসিত হয়ে উঠলো—'এই তো! এইখানেই চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেল। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের দেশের যা-কিছু বিদঘুটে বিদেশীদের কাছে তারই আদর বেশী। আজগুবী না হলে ওরা পছন্দই করবে না। নইলে ধরুন, 'বন্যমার্জ্জারীর প্রেমাবেশ' নামে মিস্ মরুলতা মজুমদারের এমন উঁচুদরের নৃত্যটা বিদেশীর কাছে কোনো আদরই পেল না। অথচ, জংলী সাঁওতালী নাচ দেখে ওরা মুগ্ধ হয়ে যায়। বিদেশী রুচির কথা আর বলবেন না। শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। ওরাই বিজয় গুপ্তকে চিনেছে।'

অক্ষয়বাবু কিছু একটা বলবার জন্য মনে মনে তৈরী হচ্ছিলেন। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট আবার প্রশ্ন করলো—'একটা ফটোর জন্য কত দক্ষিণা দেন বিজয় গুপ্তকে?'

অক্ষয়বাবু—'সাড়ে চার টাকা।'

শ্রীমন্ত বিস্ময়ে ভুঁরু কোঁচকালো—'সাড়ে চার টাকা! লোকে তিন আনা পয়সা খরচ করে ষোল নম্বর বাসে চড়ে গড়িয়া পৌঁছে একটা খালের ধারে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকালেই স্পষ্ট দেখতে

পাবে—ফাগুন লেগেছে বনে বনে। তার জন্য সাড়ে চার টাকা? অপব্যয়।'

ফটোর মূল্য সাড়ে চার টাকা শুনে মনে মনে একটু খুশি হয়ে উঠেছিল শ্রীমন্ত। অক্ষয়বাবু কিন্তু মনে মনে ঠিকই জানছিলেন এবং দুঃখ করছিলেন—বিজয় গুপ্তকে গুনে গুনে দশটি টাকা দিতে হয়। কিন্তু সম্পাদকীয় স্ট্র্যাটেজি নামে একটা মনস্তাত্ত্বিক কৌশল আছে। দক্ষিণার ব্যাপারে তিনি দ্বন্দ্বী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের আগ্রহের ওপর প্যাঁচ দিয়ে একটা তত্ত্বকে সফল করে তুলতে জানেন অর্থাৎ অল্পে সুখমস্তি।

সুতরাং অক্ষয়বাবু আবার আরম্ভ করলেন—'আপনার আঁকা ছবিটার মর্ম কিন্তু কেউ বুঝতে পারলো না শ্রীমন্তবাবু। অবশ্য পিওর আর্ট বোঝবার মত লোক এই পোড়া বাংলা দেশে...'

শ্রীমন্ত বাধা দিল—'কী বলছেন অক্ষয়বাবু? পৃথিবীতে যাঁকে একমাত্র সত্যিকারের আর্ট-সমালোচক বলে জানি, সেই অধ্যাপক ত্রিদিব ভট্‌চাজ এই ছবি সম্বন্ধে কী লিখেছেন জানেন? তিনি লিখেছেন—এই ছবির মধ্যে যে অব্যয়ীভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্বদেশের ও সর্বযুগের রস। সৃষ্টি একদিন মুছিয়া যাইবে, কিন্তু শিল্পী শ্রীমন্ত সেনের আঁকা এই অত্যাশ্চর্য ছবিটির আত্মার কখনো বিনাশ হইবে না।'

উৎসাহিত হয়ে অক্ষয়বাবু বললেন,—'ঠিক কথা। খাঁটি কথা। এতক্ষণে জিনিসটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আগে এতটা বুঝতে পারি নি। ছবির নাম দিয়েছেন—'স্বর্গীয় মদের ফেনা', অথচ আকাশে একটা ভাঁড়ের মত জিনিস উপুড় হয়ে রয়েছে।'

শ্রীমন্ত—'হ্যাঁ, ওটা হলো চাঁদ।'

অক্ষয়বাবু—'আর ভাঁড়ের মুখ থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা উথলে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ছে কেন?'

শ্রীমন্ত—'হ্যাঁ, ওটা হলো জ্যোৎস্না।'

অক্ষয়বাবু—'আশ্চর্য, আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি শ্রীমন্তবাবু। কী যে বলবো, শুধু বলতে ইচ্ছে করছে—আশ্চর্য। হ্যাঁ, আপনার প্রাপ্য দক্ষিণাটা নিয়ে যান। এই নিন—আট টাকা দিলাম আপনাকে।'

শ্রীমন্ত অপ্রস্তুত হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হঠাৎ প্রতিবাদ করার মত কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না।—'আট টাকা? বেশ তাই দিন।' একটু ইতস্তত: করে টাকা কয়টা পকেটে পুরে সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে বের হয়ে এল শ্রীমন্ত।

ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন অক্ষয়বাবু। ঘরে ঢুকলো ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্ত। দ্বিতীয় কিস্তি একটা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন অক্ষয়বাবু।

বিজয় গুপ্ত বললো—আবার আপনি জলছবি ছাপতে আরম্ভ করেছেন! স্বাক্ষরের সুনাম আর রইল না। আপনার পত্রিকা উঠে যাবে, অবধারিত।

অক্ষয়বাবু বিস্ময়ের ভান করে প্রশ্ন করলেন—'জলছবি?'

বিজয় গুপ্ত—'হ্যাঁ স্যার, শ্রীমন্ত আর্টিস্টের আঁকা ছবি। কী হয়েছে ওটা? স্বাক্ষরের মত কাগজে যদি ঐ-সব রঙীন রাবিশ ছাপান, তবে আমাদের বাদ দিন। আর্টিস্টদেরই মাথার মণি করে রাখুন আপনি।'

অক্ষয়বাবু লজ্জায় জিভ কাটলেন—'ছিঃ, ওরকম করে বলবেন না—বিজয় বাবু। বিদেশের গুণী আর রসিকেরা শ্রীমন্ত সেনের ছবির কদর জানে। আজই নিউ ইয়র্কের একটা পত্রিকার প্রতিনিধি এসে 'স্বর্গীয় মদের ফেনা' ছাপবার জন্য তিনশো টাকা দক্ষিণা দিয়ে শ্রীমন্ত

সেনের অনুমতি নিয়ে গেছে। অথচ আমরা ঐ ছবির কতটুকু মূল্য দিতে পেরেছি, পাঁচটী টাকা মাত্র। এই তো?'

বিজয় গুপ্তের উত্তেজনা হঠাৎ কেমন মিইয়ে এল। নেহাৎ অজ্ঞাতসারেই একটা সমবেদনার আভাস যেন তার কথার মধ্যে ফুটে উঠলো। —'মাত্র পাঁচ টাকা সে কী অক্ষয়বাবু?'

অক্ষয়বাবু—'হ্যাঁ বিজয়বাবু, এমন একজন আর্টিস্টের আঁকা ছবির মূল্য পাঁচ টাকার বেশী দেবার সামর্থ্য নেই আমাদের। আর ধরুন, সত্যি কথা বলতে গেলে, আপনারা অর্থাৎ ফটোগ্রাফারেরা যা করেন, তার মধ্যে আর্ট বলে জিনিসের বালাই নেই। ভাল ক্যামেরা, ভাল ফটো—বাস্, আপনাদের কাজ হলো যন্ত্রের কাজ। তবু আপনার দক্ষিণা…'

বিজয় গুপ্তের সারা মুখে একটা রক্তাভ উচ্ছ্বাস দেখা যায়। সে সব সহ্য করতে পারে কিন্তু ফটোগ্রাফীর নিন্দা বরদাস্ত করা তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। বিজয় গুপ্তকে তাঁর ফটোগ্রাফার গুরু শিখিয়ে দিয়েছেন—ফটোগ্রাফী যন্ত্রের খেলা নয়, ফটোশিল্পীরাও শিল্পী, বরং তারাই নতুন যুগের শিল্পী। গুরুদত্ত সেই বাণীকে সম্পাদক অক্ষয়বাবু নিন্দে করে ভয়ানক ভুল করেছেন। ফটোগ্রাফীর নিন্দা—এখানে কারও কাছে হার মেনে কোন আপোস করতে রাজী নয় বিজয় গুপ্ত। নেহাৎ সহ্য করতে না পেরেই বিজয় গুপ্ত বললো—'কথাগুলি সংযত করুন অক্ষয়বাবু।'

অক্ষয়বাবু—'বেশ বেশ, মাপ করবেন। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম আর্টিস্ট যেমন কল্পনাকে রূপ দিতে পারে…'

বিজয় গুপ্ত—'ফটোশিল্পী বাস্তবের রূপ ধরে দিতে পারে।'

অক্ষয়বাবু—'আর্টিস্টের তুলিতে যেন একটা অতীন্দ্রিয় রোমান্স আছে।'

বিজয় গুপ্ত—'ক্যামেরার সেলুলয়েডের চোখে সত্যের রোমান্স আছে।'

অক্ষয়বাবু—'আর্টিস্টরা…'

বিজয় গুপ্ত বাধা দিয়ে বললো—'আর্টিস্টরা বস্তুর ওপর মিথ্যার রূপ দেয়। ওটা রঙের ছলনা।'

অক্ষয়বাবু—'তাহলে ফটোগ্রাফারেরা…'

বিজয় গুপ্ত—'ফটোগ্রাফারেরা মিথ্যার আবরণ সরিয়ে দিয়ে বস্তুর রূপ খুলে দেয়।'

অক্ষয়বাবু আবেগভরে বলে উঠলেন—'আশ্চর্য, আপনি আমাকে আশ্চর্য করে দিলেন বিজয়বাবু। এভাবে আমি কোনদিন ভেবে দেখি নি। আপনার কথায় বুঝলাম সত্যিই আপনারা—কী বলবো! আপনারা হলেন—আর্টিস্টরূপী শশক-জম্বুক সঙ্কুলিত মানব অরণ্যের শিল্পীকেশরী।'

বিজয় গুপ্ত শান্ত হয়ে বললো—'আজকের মতো উঠি।'

সিগারেটের ডিবেটা এগিয়ে দিয়ে স্মিতমুখে সম্পাদক অক্ষয়বাবু বললেন—'আসুন। সেই প্রতিযোগিতার কথা স্মরণে রেখেছেন তো? উঠে পড়ে লাগুন এইবার, আর যে সময় নেই।'

চলে আসবার আগে বিজয় গুপ্ত উৎসাহিত ভাবেই উত্তর দিল—'নিশ্চয় মনে আছে। আসি। নমস্কার।'

কোনো একটি দেশকল্যাণ সমিতি থেকে একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে আর্টিস্ট এবং ফটোগ্রাফারদের কাছ থেকে—'অনশন ও বুভুক্ষার ফলে মানবতার চরম ক্ষতি কি হইতে পারে, এই বিষয়ে যে শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র অথবা তোলা ফটো সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবে, সেই শিল্পীকে মাতৃমঙ্গল সমিতি পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিবেন।'

স্বাক্ষর পত্রিকার তরফে সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী অক্ষয়বাবু অতিরিক্ত আরও একশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। প্রতিযোগী শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং তোলা ফটো—সবই আগামী সংখ্যা স্বাক্ষরের কলেবর অলঙ্কৃত করে প্রকাশিত হবে।

আর্টিস্ট বনাম ফটোগ্রাফার—প্রতিযোগিতাই শেষাশেষি একটা শ্রেণীদ্বন্দ্বের মত হয়ে দাঁড়াল। বহু আর্টিস্ট যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সব চেয়ে বড় ভরসা শ্রীমন্ত সেন। শ্রীমন্তের হাতের তুলি দুর্বল নয়, তার কল্পনা অনুজ্জ্বল নয়। তার রঙে কত ব্যঞ্জনা, রেখায় কত দ্যোতনা ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট চুপ করে বসে নেই। তার সমস্ত শক্তি ও প্রতিভাকে সংহত করে ষ্টুডিওর নিরালায় বসে এক রকম ধ্যানস্থ হয়ে আছে শ্রীমন্ত। রাত জাগতে হচ্ছে—স্নানাহার করতে ভুলে যাচ্ছে। আর্টিস্ট সম্প্রদায়ের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব শ্রীমন্ত সেনের ওপর পড়েছে।

ফটোগ্রাফারেরাও কম উতলা হয় নি। ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে গেছে তারা। নিজের নিজের জয় পরাজয়ের কথা তারা ভাবে না। তারা শুধু কায়মনে প্রার্থনা করে ফটোগ্রাফার সম্প্রদায়ের জয় হোক। অর্থাৎ বিজয় গুপ্তের জয় হোক। বিজয় গুপ্তকে তারা শতভাবে প্রেরণা দিয়ে বলেছে—'আমাদের মান সম্মান আপনার হাতে বিজয়বাবু। জলছবিওয়ালাদের কাছে যদি হেরে যাই, তবে এ-জীবনে ক্যামেরা আর স্পর্শ করবো না!'

বিজয়কে তারা রোজই দেখছে। সকাল হতেই কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে পথে বের হয়ে পড়ে বিজয় গুপ্ত। কোনো ক্রুটী করছে না সে। খোলা আকাশ, প্রভাতের সূর্যালোক, সন্ধ্যার রক্তিম মেঘ, কলকাতার উত্তপ্ত পথের রৌদ্রজ্বালা—এই তার ষ্টুডিও। ফুটপাতে, গাছতলায়, বস্তির অন্তরে—পথে প্রান্তরে মানবতার সেই চরম ক্ষতির দুর্লক্ষ্য

চিহ্ন আবিষ্কারের যাত্রায় বের হয়েছে বিজয় গুপ্ত। ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই।

স্বাক্ষর পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। একটা তীব্র ঔৎসুক্যের স্পন্দন শত শত গ্রাহক পাঠক ও উৎসাহীর মনের অনুভব ছেয়ে রেখেছে ঠিক এই মুহূর্তটীতে। সদ্য প্রকাশিত স্বাক্ষরের পাতা উল্টিয়ে দেখছেন সমালোচকেরা। গ্রাহকেরা দেখছেন সাগ্রহে। মেসে বোর্ডিংয়ে ছাত্র হোটেলে লাইব্রেরীতে কৌতূহলী পাঠকের মাথার ভিড় স্বাক্ষর পত্রিকার ওপর ঠোকাঠুকি করছে। পরীক্ষকেরা প্রতিযোগী শিল্পীদের নামের তালিকা হাতে নিয়ে নম্বর দিচ্ছেন একে একে—ঠিক এই মুহূর্তটীতে।

প্রথম পৃষ্ঠা খুলতেই দর্শকের চোখের ওপর একটা বিচিত্র বর্ণ-রাগের আলিম্পন ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে। আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেনের আঁকা ছবি। দর্শকদের মনের গহন থেকে আপনা-আপনি একটা করুণতম আক্ষেপধ্বনি উৎসারিত হয়—আহা! যাঁরা একটু আবেগ-প্রবণ তাঁদের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কী করুণ এই ছবি!

—পথের পাশে একটি গাছের ছায়ায় এক ক্ষুধাজীর্ণ ভিখারিণী বসে আছে। তার কোলে একটী মুমূর্ষু শিশু। শিশুটির অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। অস্থিসার ভিখারিণী মাতার বুকে শিশু-প্রাণের পানীয় সেই জীবতুষ্টির ধারা শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মুমূর্ষু শিশুর তৃষ্ণার্ত অধর শুধু শেষ বিদায়ের আক্ষেপে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। আর ভিখারী মাতার চোখ থেকে একটি দুটি করে তপ্ত মুক্তার মত জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে শিশুটির অধরে।

ব্যর্থ মাতৃত্বের একটি সুকরুণ দৃশ্য। সার্থক ছবি। কোনো সন্দেহ থাকে না, আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেনের জন্যই জয়মাল্যের পুরস্কার অবধারিত।

পরীক্ষকেরা পাতা উল্টিয়ে যান। পর পর কত ছবি কত ফটো বিচিত্র পটক্ষেপের মত পাঠক ও দর্শকের চোখের উপর দিয়ে চকিতে পার হয়ে যায়। কোনো ছবি, কোনো ফটো মনে ধরে না পরীক্ষকদের। শ্রীমন্ত সেনের আঁকা ছবির তুলনায় সবই নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে পরীক্ষকেরা কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে থাকেন। ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্তের তোলা ফটো শুধু পরীক্ষকেরা নয়, ঠিক এই মুহূর্তটিতে গ্রাহক পাঠক ও উৎসাহী দল ঠিক এমনি ভাবে ফটোর দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকে। যুগযুগান্তর প্রত্যয়ে লালিত একটা মোহ রূঢ় আঘাতে যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। রূপকথা নয়, কল্পনা নয়, কিংবদন্তী নয়, কলকাতার পথের উপর কুড়িয়ে পাওয়া একটা নিরলঙ্কার ছবি!

—এক শিশু সেবা প্রতিষ্ঠানের দুগ্ধ-বিতরণ-কেন্দ্রের সামনে গাছের তলায় এক ভিখারী মাতা বসে আছে। তার কোলের উপর মুমূর্ষু শিশু সন্তান। শিশুটির বুকের পাঁজরা থর থর করে কাঁপছে। বিস্ফারিত ঠোঁট দুটিতে বিদায়ী প্রাণবায়ুর শেষ সাড়া ফুটে উঠেছে। আর ভিখারিণী মাতা পরম প্রসন্ন মনে এক মগ ভর্তি দুধ ঢক ঢক করে খেয়ে চলেছে।

শোকাহতের মত পরীক্ষকেরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। লুপ্ত মাতৃত্বের একটি নিষ্ঠুর ছবি। মানবতার চরম ক্ষতি। শ্রেষ্ঠ ছবি।

পরীক্ষকেরা নম্বর দিলেন। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্ত। পুরস্কার ঘোষণা করলেন পরীক্ষকেরা।

ঠিক এই মুহূর্তটিতে আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেন স্বাক্ষর পত্রিকাটিকে বন্ধ করে তুলে রাখলো। একটা মূর্চ্ছাভঙ্গের পর যেন সে জেগে উঠেছে। রঙের তুলিগুলো একে একে ধুয়ে দেরাজে বন্ধ করলো। তারপর কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখলো—'আমার অভিনন্দন জানবেন বিজয়বাবু।'

গল্পলোক । একতীর্থা

এক তীর্থা

শনিবার দিনটা বীণা দিদিমণির কাছে ব্রত-পার্বণের মত। তেমনি আয়োজন উৎসাহ আর নিষ্ঠা—আনন্দের প্রসাদও কিছু কম নয়। বেলা দেড়টার সময় স্কুলের ছুটী হবে। সোজা গিয়ে হোস্টেলে তাঁর সাজানো ঘরটিতে ঢুকবেন। একখানা দুধে গরদের শাড়ি পরবেন। নরম দেখে একটা ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে দেবেন। কোনো প্রয়োজন নেই, তবু ছাতাটা নিতে ভুলবেন না। নিকেলের ফ্রেমের চশমাটা পরা চাই-ই—সেটার প্রয়োজন আছে। তারপর বের হবেন। প্রথমে গৌরীদের বাড়ি, তারপর লীলাদের বাড়ি—সেখান থেকে পর পর শান্তি আর অর্চনাদের বাড়ি। চারটি মেয়েই তাঁর ছাত্রী। শনিবার দিন সিনেমাতে গিয়ে একটা ছবি দেখতেই হবে—না দেখলে চলে না। সে ছবি বাংলাই হোক, আর ইংরাজীই হোক—হিন্দী হলেই বা আপত্তির কি আছে? একা ছবি দেখে সুখ হয় না বীণা দিদিমণির। শিষ্যা কয়টি সঙ্গে থাকে।

বুড়ো মানুষ বীণা দিদিমণি—বিধবা ও নিঃসন্তান। স্কুলটাতেই ত্রিশটি বছর পার করে দিলেন। স্কুলবাড়িটা যখন একটা আটচালা ছিল মাত্র আর ছাত্রী ছিল ষোলটি—তখন থেকেই তিনি আছেন। এখন না হয় এত বড় একটা দালানবাড়ি হয়েছে—ডবল এম-এ মিস্ নিয়োগী হেড মিস্ট্রেস রয়েছেন। আরও তেরটি টীচার আছেন।

হোস্টেলের সবচেয়ে ভাল ঘরটি বেছে নিয়েছেন বীণা দিদিমণি। মিস্ নিয়োগী যেটায় থাকেন—সেটা আরও ছোট ও দেখতে খারাপ। যেদিন ইনস্পেকট্রেস্ আসবার কথা থাকে—সেদিন সকাল থেকে

টীচারদের মধ্যে সাড়া আর কাজের তাড়া লেগে যায়। বীণা দিদিমণি সেদিনও নিশ্চিন্ত মনে, নিরুদ্বেগ প্রশান্তির সঙ্গে সাড়ে দশটার সময় স্নানাহার সেরে বিছানার ওপর আর একবার গড়িয়ে পড়েন। মিস্ নিয়োগী খবর পেয়ে বিরক্ত হয়ে বীণা দিদিমণির ঘরে এসে ঢোকেন। —'এ কী? দিব্যি শুয়ে পড়ে আছেন? উঠুন এখন, ক্লাসে গিয়ে বসুন।'

বীণা দিদিমণি মিস্ নিয়োগীর দিকে একবার তাকিয়ে গা-মোড়া দিয়ে পাশ ফেরেন। হাত তুলে তাকের ওপর হাতপাখাটা দেখিয়ে দেন। বলেন—'ঘাড়ের কাছটায় এইখানে একটু বাতাস করতো ভুতি।'

মিস্ নিয়োগীর সঙ্কট আর বিরক্তি চরম হয়ে ওঠে। পাখাটা নিয়ে উগ্র উৎসাহে ঝটপট্ কিছুক্ষণ বাতাস করেন। তারপরেই ব্যস্ত দ্রুত চলে যান—এগারটা বাজে প্রায়, ইনস্পেকট্রেস আসতে আর দেরী নেই।

বীণা দিদিমণির ছেলেবেলার বন্ধুর নাম গীতা। গীতা আজ দশ বছর হলো মারা গিয়েছে। গীতার স্বামী মিস্টার নিয়োগী মারা গেছেন পনের বছর আগে। সেই গীতার মেয়েই হলো মিস নিয়োগী। বীণা দিদিমণি আজও তাঁকে ভুতি বলেই জানেন। ভুতিকে তিনি এতটুকু দেখেছেন। সেই মেয়েই আজ হেড মিস্ট্রেস হয়েছে। তাতে হয়েছে কি?

বীণা দিদিমণি বেশ আছেন। সিনেমাতে ছবি দেখার বাতিকটা তাঁর নতুন। হাউসটাই তো বছর পাঁচেক হলো হয়েছে। এর আগে গ্রামোফোন রেকর্ড শোনার সখ ছিল বীণা দিদিমণির। তার আগে পড়তেন উপন্যাস। তারও আগে শুধু চিঠি লিখতেন—চেনা, আধ-চেনা, একেবারে অচেনা—কোনো একটা সম্পর্ক আর প্রসঙ্গ পেলেই

তাদের চিঠি লিখতেন। সংসারে আপন বলতে কেউ ছিল না, তাই চিঠির জাল ছড়িয়ে বিরাট একটা আপনত্বের সংসার ছেঁকে ধরেছিলেন দিস্তা দিস্তা কাগজ আর ডজন ডজন টিকিট উজাড় করে সেই চিঠির পৃথিবীকে ধরে রাখলেন প্রায় দশটা বছর। লিখতেন—ডিহীরীতে সুখময়বাবুকে, কোন্নগরে সাবিত্রীকে, রহমতগঞ্জে গীতাকে···আরও কত কাকে কে জানে? ট্রেনে যেতে আলাপ হয়েছিল এক নবদম্পতীর সঙ্গে মীরাটের ডাক্তার শচীন রায় ও তাঁর স্ত্রী চপলা। জীবনে দ্বিতীয়বার আর এঁদের সঙ্গে বীণা দিদিমণির দেখা হয় নি—তবু তিনটি বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত চিঠির বন্ধনে অন্তরঙ্গ করে রাখলেন তাঁদের। চপলার ছেলের অন্নপ্রাশন পর্যন্ত খবর পেয়েছিলেন—তারপর আর কিছু জানেন না।

তারপর আগে শুধু ব্রত করার বাতিক পেয়েছিল বীণা দিদিমণিকে। এই সব পুরনো ইতিহাসের ঘটনা বলতে গেলে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা এসে পড়ে। তখন সবে একটি বছর মাত্র হয়েছে—স্বামী হারিয়েছেন বীণা দিদিমণি।

এখন বীণা দিদিমণির শরীর অশক্ত, স্কুলের কাজে ক্রটী হয়। এর জন্য তাঁকে বলে লাভ নেই। বেশী কিছু বলতে গেলে চরম জবাব শুনিয়ে দেবেন—আমার স্কুলের ভাল মন্দ আমি বুঝব।

স্কুলটা যে তাঁর নয়, কোনো কালেই ছিল না—এই সত্যটা তাঁকে বুঝিয়ে বলবে কে?

বীণা দিদিমণির কাছে ছাত্রীরা বড় কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে গৌরী লীলা শান্তি আর অর্চনা। স্কুলের মধ্যে বড় মেয়ে বলতে এরাই চারজন।

গৌরীর পিউরিটান দাদা সিনেমা দেখা পছন্দ করে না। লীলার মেজ কাকা কৃপণ মানুষ—সিনেমায় অযথা পয়সার অপব্যয় সইতে

পারেন না। শান্তির বাবা সব সময় কাজে ব্যস্ত—একটুও সময় নেই যে মেয়েদের ছবি দেখাতে নিয়ে যান—ইচ্ছে থাকলেও। অর্চনার বাড়িতে পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই। ওরা মায়ে-ঝিয়ে দুজনেই বিধবা। অর্চনার মা জপ তপ নিয়েই আছেন। স্কুল ছাড়া অর্চনাও বাকী সময়টুকু এমব্রয়ডারীর কাজ নিয়ে বসে। সেটাও একরকম জপের মত ব্যাপার। তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল অর্চনার, সাড়ে তের বছরে বয়সে বিধবা হয়েছে। মায়ের প্রেরণায় সত্যি করে জপ তপ ধরবে ধরবে—এইরকম একটা দ্বিধা আর আগ্রহের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছে গেছে অর্চনা।

এই সব বিপত্তিকে ঠেকিয়ে রেখেছেন বীণা দিদিমণি। চারটি শিষ্যার সিনেমা দেখার সব দায় তিনি নিজেই বরণ করে নিয়েছেন। টিকিট কেনার খরচ তিনিই বহন করেন। ছাত্রীদের বাড়ি থেকে নিয়ে যান, বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসেন। স্বয়ং উপস্থিত থেকে সাজ সজ্জার নির্দেশ দেন। বীণা দিদিমণির পছন্দ না হলে শাড়ি বদলাতে হয়। গৌরীকে লালরঙা শাড়ি কিছুতেই পরতে দেন না। শান্তিকে সিল্ক পরতে দেন না।

কোনো অভিভাবকের কোনো আপত্তি টিকতে পারে না। বাণা দিদিমণি চার বাড়ি ঘুরে চারটি শিষ্যা নিয়ে সগর্বে ও সহর্ষে সিনেমা-যাত্রায় বার হন। বীণা দিদিমণির এই এক বাতিক। এই বয়সে মানুষে তীর্থ-যাত্রা করে।

রাত্রি নটার পর কিরণবাবুদের বাগানের পাশ দিয়ে একটা জ্বলন্ত টর্চ হেলেদুলে চলে যায়। সবাই বুঝতে পারে, বীণা দিদিমণি তাঁর শনিবারের তীর্থ সেরে হোস্টেলে ফিরছেন। বুড়ো মানুষ—একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন।

হাউস ভরা দর্শক ও দর্শকা। তারই একটি অংশে বীণা দিদিমণি —দুপাশে চারটি শিষ্যা। জনতার মাঝখানে যেন নিজের একটি দরবার তৈরী করে সর্বেশ্বরীর মত বসে থাকেন বীণা দিদিমণি। পেট-মোটা মনিব্যাগটা দিদিমণির কোলের উপরেই পড়ে থাকে। গৌরী লীলা শান্তি আর অর্চনার যত রকম তুবু্দ্ধির খোরাক যোগাতে ব্যাগটা ক্রমে ক্রমে চুপসে আসে। চার প্যাকেট বাদাম খাওয়া শেষ হতে না হতেই শান্তি তেষ্টায় ছটফট করে ওঠে। লেমনেড আসে। অর্চনা তু'বার হাঁচে—এক কাপ চা আসে। তারপর আরও তিন কাপ।

বীণা দিদিমণি বলেন—কী আরম্ভ করলে তোমরা? খাবে না ছবি দেখবে?

ছবি আরম্ভ হবার আগেই বীণা দিদিমণি বলেন—চশমাটা একটু মুছে দাও তো শান্তি।

শান্তি বীণা দিদিমণির নাক থেকে তখুনি চশমাটা তুলে নেয়। গৌরী মুখের ভাপ দিয়ে চশমার কাঁচ তুটো বাষ্পধৌত করে। লীলা আঁচল দিয়ে ঘসে ঝকঝক করে দেয়। অর্চনা চশমাটা আবার দিদিমণির নাকের উপর বসিয়ে দেয়।

ছবি আরম্ভ হয়ে যায়। ঐ নগণ্য একটা সাদা পর্দার ওপর মুহূর্তের মধ্যে কী বিচিত্র এক আলোক-কণিকার উৎসব জেগে ওঠে। শব্দে রূপে ও গতিতে মূর্ত কোনো এক অদৃশ্য গ্রহবিচ্ছুরিত সুখ-তুঃখ বিরহ-মিলন ও পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী নৃত্য করতে থাকে। অলীক বাস্তব হয়ে যায়।

'দেবদাসী অম্বালিকার গোপন প্রেমের কীর্তি ধরা পড়ে গেছে। মন্দিরের গায়ে মূর্তি উৎকীর্ণ করত তরুণ একটি ভাস্কর—মাধব তার নাম। অম্বালিকার জীবনযৌবন মাধবের প্রেমে বাঁধা পড়ে গেছে। মন্দিরাধীশ শ্রীধর ভট্টেশ্বর অপমানে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। কত

নিশীথে মণিমাণিক্যের ডালা নিয়ে এই অম্বালিকার অনুরাগ ক্রয় করার চেষ্টা করেছেন। সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে। দেবদাসীর সেই ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করতে পারেন না তিনি। তাই শাস্তির আয়োজন হয়েছে। মন্দিরের গোপন একটি প্রকোষ্ঠে শতাধিক লম্পটের এক আসরে অম্বালিকাকে নাচতে হবে—বিবসনা হয়ে।

অম্বালিকার মুখে উগ্র রকমের একটা শ্রী ফুটে উঠেছে। বিভোর হয়ে নেচে চলেছে। নাচতে নাচতে আজ যেন সে ফুরিয়ে যাবে। নেচে নেচেই বোধ হয় আত্মহত্যা করবে অম্বালিকা। নূপুরগুলি ছিঁড়ে ছিটকে পড়ছে চারিদিকে।

অম্বালিকা হঠাৎ এক হিংস্র আক্রোশে থাবা দিয়ে তার বুকের নিচোল খিমচে ধরলো—আর এক হাতে নীবিবন্ধ। একটি নিষ্ঠুর টানে অম্বালিকা এখনি ছিন্নভিন্ন করে দেবে সেই লজ্জার শেষ আবরণটুকু।

বীণা দিদিমণির তন্ময়তা সতর্ক হয়ে উঠলো। দুপাশে শিষ্যাদের দিকে একবার তাকালেন। স্থির নক্ষত্রের মত সবারই চোখে কৌতূহল ফুটে রয়েছে। সিনেমার পর্দায় কাহিনীর সেই প্রচণ্ড পরিণামকে বরণ করার জন্য যেন সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

বীণা দিদিমণির সুগম্ভীর আদেশ বেজে উঠলো—গৌরী লীলা, চোখ নামাও। শান্তি অর্চনা, চোখ নামাও। আবার যখন বলবো, তখন দেখবে। চোখ নামাও সবাই।

দুপাশে সুবাধ্যা শিষ্যা চারটি পর্দা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মেজের দিকে তাকিয়ে রইল। চারটি অবনত মুখ মিচ্‌কে মিচ্‌কে হাসছিল। শান্তি একবার খুব সাবধানে ঘাড়টা বেঁকিয়ে বীণা দিদিমণির দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো। দিদিমণি আস্তে গর্জন করে উঠলেন—কী হচ্ছে অবাধ্য মেয়ে?

মাত্র পাঁচটি মিনিট এই অধোবদন দশা। দিদিমণি বললেন—হ্যাঁ, এইবার দেখ।

গৌরী বললো—আর দেখে কী হবে? মাঝখানে এ-রকম ভাবে বাদ পড়ে গেলে গল্পটা কী আর বুঝবো?

দিদিমণি—খুব বুঝবে, এমন কিছু ঘটে নি। মাধব হঠাৎ পৌঁছে গিয়ে অম্বালিকার মান বাঁচাবার জন্যে ওড়নার মত একটা কাপড় দিয়ে অম্বালিকাকে ঢেকে দিল। অম্বালিকা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। দুটো প্রহরী এসে মাধবকে বন্দী করলো। মাধবেরই বিচার আরম্ভ হয়েছে—দেখ সবাই। দেখে যাও, গোল করো না।

গৌরী আর লীলা—দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। দুজনেই শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। বীণা দিদিমণির সিনেমাসঙ্গিনী মাত্র দুটি – শান্তি আর অর্চনা।

দিদিমণি মাঝে মাঝে বলেন—গৌরী আর লীলা আবার আসবেই তো; কিন্তু কে জানে কবে? আবার ফুর্তি হবে এক সঙ্গে, কী বল শান্তি?

শান্তি আর অর্চনা একসঙ্গে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, দিদিমণি!

কিছুদিন পরেই শনিবারের সিনেমাব্রত আবার আগের মত ফুর্তিতে প্রবল হয়ে উঠলো। বীণা দিদিমণি খবর পেয়েছেন—গৌরী আর লীলা শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। দিদিমণি দুপুর থেকেই এসে ভিড়লেন। দেখলেন, গৌরীর চেহারাটা গিন্নীগোছের হয়ে গেছে। লীলা আরও সুন্দর হয়েছে।

গৌরীর সামনে দাঁড়িয়ে একেবারে স্পষ্ট ক্ষমাহীন নির্দেশের সুরে বীণা দিদিমণি বললেন—নাও, আর দেরী করো না। বাক্স খোল। বরের চিঠি দাও।

গৌরী বার বার করুণভাবে অনুনয় করলো—এর পরের চিঠিটা আসুক, নিশ্চয় দেখাবো দিদিমণি।

অবিচল দিদিমণি বললেন—না, আজ যেটা এসেছে, আমি সেটাই পড়বো।

লীলার অদৃষ্টেও তাই ছিল। লীলা প্রায় কেঁদে ফেললো। খুড়িমা লীলাকে ধমক দিয়ে বললেন—কী হয়েছে তাতে? বুড়ো মানুষ, এত ভালবাসে বলেই দেখতে চাইছেন চিঠিটা। কোনো দোষ নেই তাতে।

খুড়িমা হাসি চেপে অন্য ঘরে চলে গেলেন। বীণা দিদিমণি আদ্যোপান্ত চিঠি পড়লেন। ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—বড় খুশি হলাম। বেশ ভাব হয়েছে দুজনে, এই তো চাই।

আবার চারিটি শিষ্যা নিয়ে বহুদিন পরে সিনেমায় ছবি দেখতে বসলেন বীণা দিদিমণি।

'তপন নামে সুশ্রী সুন্দর ভদ্রলোকের ছেলেটি মিথ্যা দুর্নামের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সত্যি সত্যিই একটি পাপের ঘরে ঢুকেছে। যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো, স্নিগ্ধা নামে সেই মেয়েটিও এই মিথ্যা দুর্নামকে বিশ্বাস করে ভালবাসা ভেঙে দিয়েছে। তাই মতি বাইজীর ঘরে মদের পেয়ালায় চুমুকে চুমুকে উৎসব রাত্রি প্রমত্ত হয়ে উঠছে। মতি বাইজী এগিয়ে এসে বসেছে তপনের কাছে। তার হাতে একটি গেলাস—সফেন রঙীন মদ টলমল করছে। আর একটি হাত লালসার আমন্ত্রণ নিয়ে ধীরে ধীরে আগ্রহে ফণিনীর মত এগিয়ে আসছে, তপনের গলা জড়িয়ে ধরবে—বুকের কাছে টেনে আনবে।'

বীণা দিদিমণি উসখুস করে উঠলেন। কিন্তু শিষ্যা চারজন ততক্ষণে চোখ নামিয়ে ফেলেছে।

দিদিমণি বললেন—উহুঁ, গৌরী, লীলা, তোমরা দেখ। চোখ

নামাতে হবে না। শান্তি, অর্চনা, চোখ নামাও। যখন বলবো, তখন আবার···

গৌরী আর লীলা হাসতে হাসতে আবার ছবি দেখতে লাগলো। আড়চোখে শান্তি আর অর্চনাকে একবার দেখে নিল। করুণা হলো।

নতমুখী শান্তি গৌরীকে চিমটি কেটে ফিস্ ফিস্ করে শুনিয়ে দিল—হাসতে হবে না তোমাদের। সবে পরশু তো বিয়ে হয়েছে—এরই মধ্যে লাইসেন্স পেয়ে গেছ। দিদিমণির বিচারটা দেখলে অর্চনা?

অর্চনা বললো—দিদিমণি সুবিচারই করেছেন। তুমি মিছে ওদের হিংসে করছো।

শান্তিকে আর বেশীদিন হিংসে পুষে রাখতে হয় নি। অঘ্রাণেই বিয়ে হয়ে গেল। একমাস শ্বশুরবাড়িতে থেকে চলে এল।

বীণা দিদিমণির তদন্ত আর চিঠি-তল্লাসী বাদ পড়লো না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব না শুনে ছাড়লেন না। ঘরভরা লোকের সামনে শান্তিকে আচ্ছা করে ধমক দিয়ে নাজেহাল করলেন দিদিমণি—এরই মধ্যে বরের সঙ্গে একবার ঝগড়াও করেছ গবেট মেয়ে! খবরদার, ওসব যেন আর হয় না। তুটিতে খুব মিলে মিশে থাকবে।

সিনেমার আসরে আবার বহুদিন পরে চারটি সঙ্গিনী পেয়েছেন দিদিমিণি। দিদিমণির উৎসাহের স্রোতে যেন নতুন জোয়ারের আনন্দ লেগেছে। সেদিন ইংরিজী ছবি হচ্ছে।

'স্কটল্যাণ্ডের একটি নদীর উজান ধরে একটা জেলের নৌকা চলেছে। তখন সবে রাত্রি ভোর হয়েছে, দেখা গেল দূরে স্রোতের জলে এক রূপসী তরুণীর দেহ ভেসে চলেছে। এক কিশোর জেলে প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে চললো, রূপসীকে

ধরলো। খরস্রোতে দুজনেই ভেসে উধাও হলো। বিকেল হয়ে গেল। নিরালা একটা পাথুরে চড়ায় সেই তরুণ-তরুণীর আলিঙ্গনাবদ্ধ দেহ ভেসে এসে ঠেকলো। তরুণী সংজ্ঞাহীন। নির্জন পাথুরে চড়ায় বৈকালী রোদের মিষ্টি আলোকের খেলা, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি কলরব করে। এক জলপাই গাছের নীচে রূপসীকে কোলে করে বসে আছে তরুণ জেলেটি। মুগ্ধ হয়ে রূপসীর দিকে তাকিয়ে আছে। একবার হাত দিয়ে রূপসীর কপাল থেকে একগুচ্ছ ভেজা সোনালী চুল সরিয়ে দিল। তরুণ জেলের ঠোঁট দুটি তৃষ্ণার্তের মত কাঁপছে। মুর্ছিতা রূপসীর অসহায় অধরের দিকে লুব্ধ মধুপের মত এগিয়ে আসছে।'

বীণা দিদিমণি হাঁক দিলেন—চোখ নামাও।

গৌরী আর লীলার লাইসেন্স আছে, চোখ নামাতে হয় না। শান্তিও অভ্যাসবশে চোখ নামাতে যাচ্ছিল, দিদিমণি বাধা দিয়ে বললেন—তুমি দেখে যাও শান্তি। অর্চনা, তুমি ভুল করো না কিন্তু। চোখ নামিয়ে রাখ।

শুধু অর্চনা। আর বাকী কেউ নেই, সবাই ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। শুধু অর্চনা মাথা নীচু করে স্থির হয়ে বসে রইল।

গৌরী লীলা আর শান্তির ছবি দেখার আনন্দটুকু আর তেমন করে জমলো না ; ক্ষণে ক্ষণে ওরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। হেঁটমুখী অর্চনার দিকে বার বার তাকাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পরে দিদিমণি অল-ক্লীয়ার ধ্বনি ছাড়লেন—এইবার তুমি দেখতে পার অর্চনা।

অর্চনা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। শান্তি একটা ঠেলা দিতেই ধড়ফড় করে উঠে বসলো।

গৌরী লীলা শান্তি—সবাই শ্বশুরবাড়ি। বীণা দিদিমণি মাত্র একটি শিষ্যা নিয়ে সিনেমায় ছবি দেখছেন। আগের দিনের সেই জমাট ফুর্তি আজ বড় ফিকে হয়ে গেছে।

ছবি আরম্ভ হতে দেরী আছে। দিদিমণি বললেন—চা খাবে তো, এক কাপ খেয়ে নাও অর্চনা।

একটু বিমর্ষ ভাবেই দিদিমণি আবার বললেন—ওরা সবাই না এলে আর তেমন ফুর্তি হবে না। কী বল অর্চনা?

অর্চনা—হ্যাঁ দিদিমণি।

দিদিমণি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন—শ্বশুরবাড়ি থেকে যা তাগাদা, না যেয়ে আর উপায় কি? বরমশাইরাও অভিমানে অধীর হয়ে উঠেছেন, দুটো দিনও মেয়েগুলোকে টিঁকতে দিলে না। আর কখনো একসঙ্গে ছবি দেখা হবে কিনা, তাই বা কে জানে?

অর্চনা—আমার সে-ভয় নেই দিদিমণি আমি বেশ আছি।

দিদিমণি হঠাৎ বুঝতে না পেরে অর্চনার দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে একটা মূঢ়তার সুপ্তি ভেঙে যেন চমকে উঠলেন দিদিমণি।

তাইতো, অর্চনা বেশ আছে। অর্চনাই শেষ পর্যন্ত ঠিক থেকে যাবে—তাঁর শনিবারের সিনেমাযাত্রার পথে একমাত্র সহচরী। কোথাও থেকে ওর ডাক আসবার আশা নেই। তের বছরে বিয়ে, সাড়ে তের বছরে বিধবা। আজ উনিশ পার হয়ে কপালের ওপর ভুরু দুটো কালো প্রজাপতির মত ডানা মেলে ঘুমিয়ে পড়ে আছে। পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়, এমব্রয়ডারী করে, জপতপ ধরতে আর কত দেরী?

বীণা দিদিমণি গুম হয়ে বসে রইলেন। ছবি আরম্ভ হয়ে গেছে।—

'এক কুলবতী সধবা নারী, মাধবী তার নাম, যেমন সুন্দর তেমনি উচ্ছল যৌবনে তার বরাঙ্গ আকুল। নিদারুণ এক ঘটনার ছায়া ওর

ভাগ্য গ্রাস করতে বসেছে। পালঙ্কের উপর ব্যাধিজীর্ণ কঙ্কালসার তার স্বামী মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছে। সেই রূপ স্বাস্থ্য আর মেধার আধার স্বামীটি আজ রোগে কুৎসিত, ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হতে চলেছে। জল তেষ্টা পেয়েছে। তাই ক্ষীণ স্বরে স্বামীটি ডাকছে—মাধবী, মাধু, মাধুমণি—

পাশের ঘরেই এক যুবক সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী। থেকে থেকে এক গোপন দক্ষিণ সমীরের স্পর্শ ওর অলস শরীরকে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মাধবী হাসছে। মাধবীকে জড়িয়ে ধরার জন্যে সন্ন্যাসী দুটি ব্যগ্র বাহু বাড়িয়ে…'

বীণা দিদিমণি একটু নড়ে বসলেন। অর্চনার দিকে তাকালেন। অর্চনা নিমেষের মধ্যে চোখ নামিয়ে ফেললো।

দিদিমণি আর একবার ছটফট করে উঠলেন। তারপর আস্তে আস্তে ডাকলেন—অর্চনা? শুনছো? চোখ নামাতে হবে না। মাথা ওঠাও। ছবি দেখ।
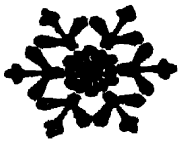
শিবালয়

সম্মুখে শালের বন, পেছনে তাল আর খেজুরের ছোট ছোট কুঞ্জ, বড় সড়কটা এইখানে এসে ডানদিকে খুব জোরে বেঁকে গেছে। এই বাঁকের ওপর একটা বস্তি। বস্তির মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘরটা হলো অনন্তরাম মুদির দোকান।

এই পথের মোড়, এই নতুন সরাই নামে ছোট বস্তিটার মধ্যেই অনন্তরামের দোকান। পথের উত্তরে ও দক্ষিণে পঁচিশ মাইলের মধ্যে এই একটি পান্থশালার ছায়া ও আলোক।

নামেই মুদির দোকান, কিন্তু শুধু চাল ডাল ছাতু আর কেরোসিন তেল নয়—জঙ্গলের পথে যত যাত্রী যায়, সবারই পক্ষে এই দোকানটি সকল প্রয়োজনের কল্পতরু। এখানে যা আছে, তা তো পাওয়া যাবেই। তা ছাড়া যা আশা করা যায় না, তাও পাওয়া যায়, শুধু অনন্তরামের কাছে অনুরোধ করলেই হলো।

যাত্রী বোঝাই বাস থামে। চা সরবৎ ছাতু, যা দরকার সবই পাওয়া যাবে। কেউ হয়তো জ্বরের জ্বালায় ধুঁকছেন, শুধু বিশ্বাস করে চাইলে অনন্তরামের কাছে দু'চারটে কবরেজী বড়ি পাওয়া যাবে। কোনো কোনো সময় মোটর বাস পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যায়। কোনো নিষ্ঠাবান পাঁড়েজীর আহ্নিকের সময় পার হয়ে যেতে বসে। কিন্তু চাইলেই অনন্তরামের কাছে পূজোর উপকরণ সবই পাওয়া যায় —কোশা কুশী ঘট গঙ্গাজল।

হ্যাঁ, পয়সা নেয় অনন্তরাম। কিন্তু শুধু পয়সা রোজগারের জন্যই সে সব সময় তৈরী হয়ে রয়েছে, একথা বিশ্বাস করা উচিত নয়।

নইলে গ্রীষ্মের সময়, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত যাত্রীর জন্য কলসী ভরে এত জল সাজিয়ে রাখতো না অনন্ত। জল দিতে দিতে অনন্তরাম এত ক্লান্ত হয়ে পড়তো না। এই শ্রান্তির বিনিময়ে কিছুই সে পায় না। বরং, মাঝরাত্রে যখন ছোট প্রদীপের আলোকে সারাদিনের বিক্রীর হিসাব করতে বসে, তখনই শুধু আবিষ্কার করে অনন্ত —সারাদিন শুধু বিলোনই সার হয়েছে, বিক্রী ফাঁকিয়ে গেছে, পয়সার বাক্সটা ফাঁকা।

কিন্তু কে বলবে অনন্তরাম সুখী নয়? তার ছোট মুদিখানার দোকানটার মতই তার সুখের রূপ, সবই হাতের কাছে, সবই মুঠোর মধ্যে। তা ছাড়া, প্রমীলার দুটি কালো চোখের ডুবুডুবু বিস্ময় আর দুটি অভিমানভরা ঠোঁটের দিকে তাকালেই অনন্তরামের সুখী সংসারের আর একটা রূপ চোখে পড়ে, যেন মহাসাগরের একটি টুকরো। সীমা আছে, কিন্তু বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কত ঢেউ, কত কলরোল! প্রমীলা যখন অভিমান করে কাঁদে, মনে হয় এ কান্না কখনো শেষ হবে না। যখন খুশি হয়ে হাসে, তখন সে হাসিরও যেন সীমা থাকে না।

আজও এইমাত্র হিসেব শেষ হয়, রাত্রি ঘনায়। প্রদীপের আলো মৃদুতর হয়। কিন্তু অনন্তরাম চুপ করে বসে থাকে। ঘরের ভেতর থেকে কোনো সাড়া আসে না। প্রমীলা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইচ্ছে করে, অভিমান করেই ঘুমিয়ে আছে। আজ আর কোনো সাড়া দেবে না প্রমীলা।

ঘরের ভেতর উঠে যেতে চায় না অনন্ত। পিলসুজের কাছেই হয়তো খাবারের থালাটা পড়ে আছে। এক রাশ পুড়ে-মরা পোকা ছড়িয়ে আছে থালার ওপরে, চারিদিকে। এখন মনে হয়, সংসার সাগরের সুখ শুধু লোনা জলের মত। অনন্তের চিন্তায় একটা অকারণ

শাস্তি ও অপমানের জ্বালা যেন ধীরে ধীরে বেদনা ছড়াতে থাকে। এতদিনেও যেন প্রমীলাকে ঠিক চিনতে পারা গেল না। প্রমীলা জীবনে কি চায়, কি সম্পদ সে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে, কোথায় তার শূন্যতা, কি তার না-পাওয়া, আজও তার পরিচয় আবিষ্কার করে উঠতে পারে নি অনন্ত। মুখ ফুটে বলুক প্রমীলা—কি পেলে সে সুখী হবে।

কিন্তু জীবনে কোনদিনই প্রমীলা বলবে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত শত অচেনা নরনারী, কত যাত্রী, সাধু ভিখারী অনন্তের কাছে কত জিনিস দাবী করে—কত আবদারের সুরে, কত আশীর্বাদের ভঙ্গীতে, কত কৃতজ্ঞতায়! কিন্তু প্রমীলা কিছু দাবী করে না। এক প্রমীলাই শুধু অনন্তের কাছে কিছু চাইতে পারে না।

প্রদীপের সলতে আর একটু উস্কে দেয় অনন্তরাম। গভীর রাত্রির অন্ধকারে শালবনের জংলী হিংসাগুলি যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে এক একটা হালকা ঝড় ছুটছে। এক অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে ক্লান্ত পৃথিবীর ফুসফুসটা শুধু হাঁসফাঁস করছে।

তুলসীদাসের রামচরিতখানা সামনে টেনে নেয় অনন্তরাম—

অজহুঁ কছু সংশয় মন মোরে
করহু কৃপা বিনাউঁ কর জোরে

…করজোড়ে মিনতি করি হে কৃপাময়, আজও যে আমার মনে কিছু সংশয় রয়ে গেছে।

বুঝি না, কিসে এই সংশয়? কেন মন অকারণে উদাস হয়ে যায়। এই তো মাত্র দুটি মাস, প্রমীলা হাসতে হাসতে এই সংসারে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু কিসের এই মেঘ, অভিমানী চাঁদের মত প্রমীলা যার আড়ালে ক্ষণে ক্ষণে লুকিয়ে পড়ে? কিসের দুঃখ!

অনন্তের গলার স্বরের রেশ ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে আসে,

দুচোখে ঘুমের আরাম স্বপ্নের মত নেমে আসে। ঘরের ভেতর প্রমীলার হাতের চুড়ির নিক্কন যেন আর একটা স্বপ্নের ভেতর ছুট্ ফুট্ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—তারই শব্দ শুনতে পায় অনন্ত।

আর একবার মনের শেষ উৎসাহ দিয়ে গলার স্বরকে সজীব করে তুলতে চায় অনন্তরাম—

রাকারজনী ভকতি তব

রামনাম সোই সোম

তোমার ভক্তি পূর্ণিমা রাতের মত ; রামনামই তো চন্দ্র ! না, মিথ্যা এ সংশয়, অন্ধকার আসবে না, সব স্বচ্ছ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সব দেখতে পাবে তুমি।

এক শূন্যতার রহস্যকে ধরার জন্য, একটা আশ্বাস ও সান্ত্বনাকে অনন্তরামের মিষ্টি গলার সুর যেন চারদিক অন্বেষণ করে বেড়ায়। শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে অনন্ত।

সূর্য উঠবার অনেক আগেই যেন হঠাৎ একটা আলোর ধাঁধায় জেগে ওঠে অনন্ত। রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে, ডাকের গাড়ি আসবার সময় হলো। পোড়া প্রদীপটা আবার নতুন শিখার আলোকে জ্বলে উঠেছে, প্রমীলা উঠে এসেছে, অনন্তের হাত ধরে টানছে—ছি ছি, আশ্চর্য মানুষ তুমি ! এভাবে আমাকে শাস্তি দিতে হয় ?

একটু অপ্রস্তুত হয়েই অনন্ত উঠে বসে। কাঁচা ঘুমের নেশা তখনো চোখমুখের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। এলোমেলো চুল। অনন্তের মুখটা যেমন সুন্দর তেমনি করুণ দেখায়।

তার চেয়ে করুণ হয়ে উঠে প্রমীলার মুখ—ছি ছি তুমি কাল রাত্রে খাও নি ! আমাকে এত জব্দ করে তোমার কি সুখ হয় বলতো ?

অনন্তের ক্ষুব্ধ অন্ধ মনটা যেন আবার চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে। আবার তার ছোট সংসারের হৃদয়টার চেহারা নতুন করে চোখে পড়ে। সেই

সমুদ্রের মতই তো, সেই নীল জল আর কত ঢেউ। প্রমীলার চোখ দুটো ছলছল করে, তবুও হাসছে, নীলজলের ওপর চাঁদের আলোর মতন। এই তো, সব চেয়ে সত্য যা, তা একেবারে মুখোমুখি দেখা যাচ্ছে।

প্রমীলা অনন্তরামের গলা জড়িয়ে ধরলো—ওঠ, ওঠ, এত রাগ করতে নেই, লোকে দুষমনের ওপরেও এত রাগ করে না।

প্রমীলার নজরে পড়লো তুলসীদাসের রামচরিতখানা সামনে পড়ে রয়েছে। বইটা খোলা। প্রমীলা বইটা বন্ধ করে দূরে সরিয়ে রাখলো। অনুযোগের সুরে বললো—এই বইটাই তো আমার দুষমন।

অনন্তরাম চমকে প্রমীলার দিকে তাকায়। প্রমীলা কিছুমাত্র অপ্রতিভ হয় না। বরং তার প্রতিবাদ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে—আমার হাতের তৈরি খাবার খেতে তোমার মনে পড়লো না, আমাকে একবার ডাকলে না। সারা রাত তুলসীদাসের দোঁহা খেয়ে পেট ভরিয়েছ। আর এসব চলবে না বলে দিচ্ছি।

অনন্তরাম বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল—তাহলে কি হবে?

প্রমীলা—তাহলে আমিও আমার শিবালয় নিয়ে থাকবো।

অনন্তরাম আশ্চর্য হয়ে বললো—শিবালয়? কোথায় তোমার শিবালয়?

প্রমীলা—কৈলাস ভাইয়া বলেছে, আমার জন্যে ছোট একটি শিবালয় তৈরী করে দেবে। কত টাকা আর লাগবে? তুমি যদি না দাও, কৈলাস ভাইয়া দেবে।

অনন্তের মুখটা ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসতে থাকে। রহস্যটার কোনো অর্থভেদ করতে পারে না। কবে এত শিবভক্ত হয়ে উঠলো প্রমীলা? কৈলাসই বা কবে থেকে এত শিবের মহিমা উপলব্ধি করে ফেললো?

প্রমীলা বললো—কথা বলছো না যে ?

অনন্ত—আমার বলবার কিছু নেই।

প্রমীলা—তাহলে আমার শিবালয় তৈরি করে দিচ্ছ ?

অনন্ত—আমার সাধ্য নেই।

প্রমীলা—বেশ, তাহলে কৈলাস ভাইয়াকে বলি।

অনন্ত প্রমীলার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি ছড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। একসঙ্গে যেন কয়েক শত প্রশ্ন সেই দৃষ্টির ভেতর সুতীক্ষ্ণ শরের মত ছুটাছুটি করছে। একটু শান্তভাবেই বললো—শিবালয় চাও শিবপূজার জন্য, না শিবজীকে অপমান করার জন্য ?

প্রমীলা—এ কিরকম কথা হলো ?

অনন্ত—বেচারা রামচন্দ্রজীর ওপর রাগ করেই কি শিবের পূজো ধরবে ?

প্রমীলা চুপ করে রইল। অনন্ত বললো—এ-রকম ভুল করো না প্রমীলা। রামজী হোক বা শিবজী হোক, মন থেকে যাঁকে চাও, তাঁরই পূজো কর। কিন্তু আমার ওপর রাগ করে কিংবা···

প্রমীলা—কিংবা, কি ?

অনন্ত—কিংবা কৈলাস শিখিয়ে দিয়েছে বলেই তোমার শিবালয়ের সখ যদি হয়ে থাকে, তবে···

প্রমীলা একটু বেশী মাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলো—কৈলাস ভাইয়া শিখিয়ে দিলেই কি শিবজী খারাপ হয়ে গেল ? কি এমন খারাপ কাজের কথা বলেছে ?

অনন্ত—কিন্তু কৈলাস কি সত্যিই···

প্রমীলা, চোখ বড় বড় করে একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বললো—বুঝেছি, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার মতে কৈলাস একটা মানুষই নয়। সে কি আর শিবভক্ত হতে পারে ?

অনন্ত—কিন্তু সেদিনও তো দেখেছি কৈলাসের মুখে মদের গন্ধ।

প্রমীলা যেন দৃপ্তভাবে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, তোমার কথা সত্যি। কিন্তু সে কৈলাস আর নেই। সে আর মদ খায় না।

অনন্তকে আরও আশ্চর্য করে দিয়ে প্রমীলা ঘরের ভেতর চলে গেল এবং পরমুহূর্তে কতগুলি ছোট ছোট স্তোত্রের বই আর একটি বড় বই সশ্রদ্ধভাবে তুলে নিয়ে এসে অনন্তের সামনে রাখলো—এই দেখ শিবসংহিতা, আর এইগুলি সব স্তোত্র আর ভজন।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল অনন্ত। তার সংশয়ভরা প্রশ্নের পাহাড়টা নিজের মিথ্যায় চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কৈলাস আর সে-কৈলাস নয়। বোধ হয় প্রমীলা আর সে-প্রমীলা নয়। সত্যি সত্যি জীবনের ধূলিকে এক নতুন বিশ্বাসে ভিজিয়ে দিয়ে ওরা শিবালয়ের পথটি তৈরি করে ফেলেছে। কৈলাসের মতন মানুষ যে-দেবতার জন্য মদ ছেড়ে দিয়ে আত্মশুদ্ধি করেছে, সে-কৈলাসের নিষ্ঠাকে ও ত্যাগের মূল্যকে ছোট করবার মত সাহস খুঁজে পায় না অনন্ত।

অনন্তের চোখে পড়ে, প্রমীলার মাথায় বিনুনী নেই। এলোমেলো রুক্ষ চুল ছিন্ন স্তবকের মত ছড়িয়ে রয়েছে। সেই টিপ আলতা পান, গয়না আর রঙীন ওড়নার সমারোহ থেকে যেন বিদায় নিয়ে প্রমীলার মূর্তিটা রক্তশূন্য ও সাদাটে হয়ে গেছে।

তবে কি সত্যি সত্যিই যাত্রা শুরু হয়ে গেছে? তবে কি অনন্তের সংসারে শুধু রামচরিত মানসের দোঁহাগুলিই চিরকাল গম্ভীর স্বরে বাজতে থাকবে? ক্রীড়াচঞ্চল শিশু-রামের দুষ্টু পায়ের নূপুর এ-ঘরের আঙিনায় কখনো যে বেজে উঠবে, তার কোন আকাঙ্ক্ষার ছায়া নেই প্রমীলার মুখে। এক মহাশ্বেতার উদাস ছায়ামূর্তি প্রমীলাকে যেন অগোচর থেকে ইঙ্গিতে আহ্বান করেছে। প্রমীলা সরে যাচ্ছে। ওর আত্মা শুধু উপোস করে থাকতে চায়।

এই সাধনায় প্রমীলা একা নয়। কৈলাসের সাধকতা আর উপদেশের গুণেই এই নতুন শুচিতা লাভ করেছে প্রমীলা। ভাবতে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে যায়। সমস্ত ঘটনাটা আরও জটিল হয়ে পড়ে। যেন তার ছোট সংসারে রামের কৃপা আর শিবের বরে এক অদ্ভুত সংঘর্ষ বেঁধেছে। কিন্তু বাধবার কথা তো নয়, শাস্ত্রেও এ-কথা বলে না।

অনন্ত জিজ্ঞেস করে—কৈলাস কি আজ আসবে ?

প্রমীলা—না, আজ তার সারাদিন উপোস। গয়া গেছে, কাল ফিরবে।

অনন্ত—কৈলাসের কারবার ?

প্রমীলা—কারবারে আর মন নেই কৈলাস ভাইয়ের। ট্যাক্সিটাকে অন্য লোকের কাছে ঠিকে দিয়ে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ যেন সমাধিস্থের মত চুপ করে বসে থাকে অনন্ত। ডাকগাড়ি পৌঁছে গেছে, বাইরে হর্ণ বাজছে। প্রমীলা অনন্তের হাত ধরে আর একবার আগ্রহ করে টানলো—ওঠ, না খেয়ে রয়েছ। কিছু খেয়ে নাও। তাড়াতাড়ি কর, আমার অনেক কাজ আছে।

অনন্ত—কি কাজ তোমার ?

প্রমীলা—আজ আমারও উপোস। গয়া থেকে যতক্ষণ না প্রসাদ আসবে, ততক্ষণ উপোস করে থাকতেই হবে। এরই মধ্যে পূজোর যোগাড়ও করে রাখতে হবে।

কৈলাস ভাইয়া নামে ও কাজে সত্যিই ভাই। নিকট-সম্পর্কে সে অনন্তরামের ভাই দূর-সম্পর্কে প্রমীলারও ভাই। কিন্তু এই সম্পর্কের চেয়ে অনেক বড় তার আচরণ। কোথাও ফাঁকি নেই, নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা রীতিমত ছোট।

জেলা বোর্ডের আঁকাবাঁকা অফুরান পথের পীচঢালা আবেগের মত কৈলাসের ট্যাক্সি হু হু করে দৌড়ে গড়িয়ে চলে যায়—উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কখন যায় কখন আসে কোনো ঠিকঠিকানা নেই। ওর স্থিরতা নেই, নিশ্চয়তা নেই। কৈলাসের জীবনটা যেন পথে পথে ছুটাছুটি করেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। বিশ্রাম নেবার মত কোনো কঠিন ঠাঁই আজও সে খুঁজে পায় নি। আসুক ঝড় বা বর্ষা, মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলে উঠুক মাথার ওপর, শীতের হিম আর কুয়াশায় আড়ষ্ট হয়ে যাক সারা শালবন—কৈলাসের ট্যাক্সির কোনো ভাবনা চিন্তা নেই। হঠাৎ হর্ণ বাজিয়ে, দীর্ঘ দৌড়ের মত্ততায় গোঁ গোঁ করে অরণ্যের বুক চিরে ছুটে আসে এই পথের মোড়ে, ক্ষণিকের জন্য বেগ একটু মন্দ হয়, তার পরেই আবার উধাও হয়ে যায়।

মোড়ের ওপর মাঝে মাঝে কৈলাসের ট্যাক্সি থামতো। কৈলাস কখনো গাড়ি থেকে নামতো না। গাড়ির ওপর বসে বসেই চেঁচিয়ে একটা ডাক দিত—কেমন আছ অনন্ত দাদা ?

হেসে ইসারায় জবাব দিত অনন্ত—ভাল আছি।

অনন্ত জানে কৈলাস কখনো গাড়ি থেকে নেমে কাছে আসবে না। কৈলাসের গাড়ির ট্যাঙ্কে যেমন পেট্রল ভর্তি তেমনি ওর পেটে মদ আর তাড়ি টলমল করছে।

অনন্ত জানতো, ডাকলেও কাছে আসবে না কৈলাস। কৈলাস জানে, অনন্ত ডাকলেও সে তার কাছে যেতে পারে না ; বড় সাদাসিধে সাত্ত্বিক মানুষ অনন্ত দাদা। ঐ ছোট দোকানের দেড়-দু'টাকার বিক্রি, পিপাসিতকে জলদান আর রামচরিত মানসের আনন্দে মজে আছে অনন্ত। কেমন একটা শুদ্ধ মনুষ্যত্ব। সজ্জনতা আর শুচিতায় অনন্ত দাদা একটু অসাধারণ হয়ে আছে। মদের টেঁকুর তুলে এমন

মানুষের কাছে এগিয়ে যেতে পারে না কৈলাস, এটা তার নিজের বিবেকেরই বাধা।

অনন্ত এক-একবার ভোরে উঠে দেখেছে, পথের ওপর গাড়ি থামিয়ে, দারুণ শীতের রাত্রিটা গাড়ির সীটের ওপরেই কুকুরের মত ঘুমিয়ে পার করে দিয়েছে কৈলাস, তবু অনন্তের ঘরে এসে আশ্রয় নেয় নি। অনন্ত রাগ করে ধমক দিয়েছে, অনুযোগ করেছে। কৈলাস হেসে চুপ করে থাকতো।

কৈলাসের ট্যাক্সি নতুন সরাইয়ের পথের ওপর অনেকবার থেমেছে আবার চলে গেছে! কিন্তু কিছুদিন আগে একবার থামতে গিয়ে যেন কিছুক্ষণের জন্য স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। দুপুরে এসে, চলি চলি করেও চলে যেতে অনেক দেরী হয়ে গেল। রাত্রি হয়ে গেল। অনন্তরামের ঘরেই খাওয়া দাওয়া সারলো কৈলাস। এই প্রথম!

এই প্রথম দেখলো কৈলাস—প্রমীলা বহিন আজকাল এখানেই থাকে।

তারপরেই আবার অনেক দিন কৈলাসের দেখা নেই। প্রমীলা হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করে—কৈলাস ভাইয়ার খবর কি? আর যে একদিনও এল না।

অনন্ত বলে—রোজই তো ওকে দেখতে পাই।

প্রমীলা আশ্চর্য হয়—কোথায়?

অনন্ত—এই পথেই যায়, রোজই ওর ট্যাক্সি যায়।

প্রমীলার চেহারাটা ঈষৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। একটা উদাস নিশ্বাসকে লুকিয়ে ফেলবার জন্যই যেন বলে ওঠে—রোজই যায়, তবুও আসে না।

অনন্ত—কি করে আসবে বল? যা ভয়ানক মদ খায়! এই লজ্জাতেই আসতে পারে না। বড় দুঃখ হয় ওর জন্য। সবই তো

ভাল,—দেখতে শুনতে ভাল, পয়সাও ভালই রোজগার করে কিন্তু ঐ কতগুলি পাপ ঢুকেছে। একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

এত স্পষ্ট করে শুনেও সমস্ত ঘটনার ঘৃণাগুলিও যেন হঠাৎ একটা মমতার ছোঁয়ায় আরও হেঁয়ালি হয়ে ওঠে। আকাশের সূর্যটা যেন ক্ষণিকের দুঃখে নিভে যায়, জেলা বোর্ডের সড়কটা অন্ধকারের চাপে মুছে যায়। আর পথ দেখা যায় না। কৈলাসের আসা-যাওয়া বোধ হয় চিরদিন এই অন্ধকারের আড়ালেই দূরে সরে থাকবে।

কিন্তু অনন্ত জানে না, প্রমীলাও কল্পনা করতে পারে নি, এই আসা-যাওয়ার পথটুকু অটুট রাখার জন্যেই কৈলাস তখন যেন সবার অগোচরে সরে গিয়ে এক কঠোর তপস্যা করছে, মদ ছাড়বার চেষ্টা করছে। গয়া থেকে আসতে আসতে তিনবার মদের বোতল মুখের কাছে তুলে ধরে তিনবার হাত কাঁপে, নিজেকে হুঁসিয়ার করে। তারপর আর মদ খেতে পারে না। বোতলটাকে ছুঁড়ে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেয়।

ঝড়ের মত ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে চলে কৈলাস। নতুন সরাই এগিয়ে আসে। গাড়ির গতি অকারণে মন্থর হয়ে আসে। নতুন সরাই পৌঁছবার আগেই একবার হঠাৎ থেমে যায়। কিছুক্ষণ ছটফট করে কৈলাস, তারপর আর সামলাতে পারে না। একটা মদের বোতল মুখের কাছে তুলে ধরে ঢক্ ঢক্ করে খায়।

কৈলাসের প্রতি শোণিত কণায় ও স্নায়ুতে যেন নিজের দীনতার লজ্জাও পালিয়ে যাবার নেশায় চন্ চন্ করে উঠে। আবার স্টার্ট নিয়ে জোরে এক্সিলেটার চাপে কৈলাস। নতুন সরাইয়ের মোড়টুকু কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে পার হয়ে চলে যায়। অনন্ত দোকান ঘরের চৌকিতে বসে দেখতে পায়—ঐ, কৈলাস চলে গেল।

নতুন সরাইয়ের ধুলোর ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যই যেন কৈলাস এভাবে পালিয়ে যায়। কৈলাসের অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু অনন্ত জানে না, প্রমীলা জানে না, নতুন সরাইয়ের মাটিতে স্থির হয়ে দাঁড়াবার জন্য, জীবনের যত উদভ্রান্ত পথিকতার যাতনার মধ্যে এক সত্যিকারের বিশ্রান্তির গ্যারেজ খুঁজে বেড়াচ্ছে কৈলাস। একটা যোগ্যতার লাইসেন্স চাই, যেন তারই জন্য বড় কঠিন ট্রায়াল দিচ্ছে কৈলাস।

দূর গয়া রোডের ধারে, নতুন সরাইয়ের মোড়ে অনন্তের দোকান ঘরে বাতি জ্বলে। ওদিকে ধানবাদ স্টেশনের ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে গাড়ির পর্দা ফেলে দিয়ে পেছনের সীটের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে কৈলাস। মদ ছোঁয় না। নিকটেই বাজারের বীভৎস গলি-গুলির ভেতর ছোট ছোট কালিমাখা ল্যাম্পের পাশে এক একটা মেয়েমানুষের শরীর এখনো ফাঁদ পেতে সাগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আশা করে আছে এখুনি কৈলাস ওস্তাদ আসবে এই পথে। কিন্তু রাত গভীর হয়, ওস্তাদ কৈলাস আসে না।

গাড়ির ভেতর উসখুস করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে কৈলাস। ভোর হয়। হাত মুখ ধুয়ে মুসাফিরখানায় চায়ের দোকানে বসে পর পর চার কাপ চা খায় কৈলাস।

যেন রোগ থেকে সেরে উঠছে কৈলাস। এইবার যেন চোখ খুলে তাকাতে পারা যায়। তাকালেই পথ চেনা যাবে। যে'কটী যাত্রী পাওয়া যায়, ভাড়া যা-ই দিক্—এখুনি একটানা দৌড় দিয়ে সোজা পৌঁছে যাওয়া যায় নতুন সরাই। অনন্ত যদি ডাকে, সাড়া দিতে আর কোনো বাধা নেই। হয়তো এইবার এগিয়ে যেতেও পারা যায়।

কৈলাসের ট্যাক্সি যাত্রী নিয়ে ছুটতে থাকে। বেলা বাড়ে, রোদ চমকায়, বরাকর নদীর শুষ্ক বালিয়াড়িতে অভ্রের রেণু ঝিক্‌ঝিক্ করে।

রামভক্ত সাত্ত্বিক মানুষ অনন্ত এতক্ষণে পূজো সেরেছে, পাঠ শেষ করেছে, পথের পিপাসীদের জলছোলা খাওয়াবার প্রথম পালা শেষ করেছে। নতুন সরাই এসে পড়ে।

হঠাৎ কি ভেবে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দেয় কৈলাস। না, থামাতে পারা যাবে না। কোনো লাভ নেই। অনন্তের ঘরটা বড় বেশী পবিত্র। কোন ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই। যেন দেবতাদের সঙ্গে বসে আছে অনন্ত। স্নান না করে, শুদ্ধ না হয়ে ওখানে কোনো মতেই যাওয়া উচিত নয়। তা না হলে অনন্তকে যেন অপমান করা হয়।

শুধু অনন্তকে কেন, প্রমীলাকেও অপমান করা হয়। সত্যি ওরা দু'জন রাম সীতার মত। যেন ইচ্ছে করেই এই গরীবানার বনবাস গ্রহণ করেছে। অনন্তের মনটা এত নিষ্কলঙ্ক, এত সাদা—তাই তো প্রমীলা এত রঙীন। সকল মালিন্যের প্রবেশ নিষেধ এখানে।

তা ছাড়া, কৈলাস আজ বিশ্বাস করে, একা একা অনন্তের ঘরে ঢুকতে পারা যাবে না। এত শক্তি নেই তার। কোনো দেবতার হাত ধরেই এগিয়ে যেতে হবে। নইলে অনন্তের ঘরের কপাট খুলবে না। খুললেও, এক মুহূর্ত্ত টিকতে পারবে না কৈলাস।

ধুলো আর ধোঁয়ার একটি ছোট ঘূর্ণি ছুটিয়ে কৈলাসের ট্যাক্সি যেন তার সকল মালিন্যের পশরা নিয়ে পালিয়ে যায়।

অনন্ত প্রমীলাকে ডেকে আর একবার বলে—দেখলে কাণ্ড কৈলাসের আজও এল না।

প্রমীলা বলে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?

অনন্ত—বল।

প্রমীলা—তুমি কি ওকে কখনো নিন্দে টিন্দে করেছ?

অনন্ত—কখনো না। নিন্দে করবো কেন? ও তো নিজের লজ্জায় নিজেই ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

প্রমীলা—চিরকাল কি এভাবে পালিয়েই বেড়াবে?

অনন্ত—না। যেদিন রামজীর কৃপা হবে, সেদিনই সুস্থির হবে। সব ভুল বুঝতে পারবে।

রামজীর কৃপা নয়, মহাদেবের আশীর্বাদ পেয়ে গেল কৈলাস। গয়া পৌঁছে ধর্মশালার আঙ্গিনায় ট্যাক্সিটাকে রেখে দিয়ে পথে বের হলো। এক জোড়া গরদের চাদর আর ধুতি কিনলো। সহরের ভিড় ছাড়িয়ে যেন একটা সঙ্কল্পের আবেগে ধীরে ধীরে পথের পর পথ পার হয়ে বিরাট ফল্গুর বালিয়াড়ির ওপর এসে দাঁড়ালো। অস্ত যাবার আগে পশ্চিমের সূর্য ঠাণ্ডা ও লালচে হয়ে উঠছে। বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এক জায়গায় এসে থামলো কৈলাস। দু'হাত দিয়ে বালি খুঁড়ে একটা গর্ত তৈরী করলো। যেন এতদিনের ধোঁয়া আর ধুলার জীবনের সমাধি খুঁড়ছে কৈলাস।

সূর্য ডুবে গেছে। চারিদিক আবছা হয়ে গেছে। কৈলাস হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলো, তবু তার সমাধির কূপ এতক্ষণে ঠাণ্ডা জলে ভরে উঠেছে।

স্নান সেরে নিয়ে কৈলাস আবার ফিরে চললো। পথের ওপর একটা মন্দিরের সিঁড়ির কাছে আলো জ্বালিয়ে একটা লোক হরেক রকম ধর্মের বই বিক্রী করছিল। কৈলাস কিছুক্ষণ দাঁড়াল, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপরই একখণ্ড শিবসংহিতা কিনে ধর্মশালার দিকে ফিরে চললো।

এর পর আর কৈলাসকে ডাকতে হয় নি। কৈলাসের ট্যাক্সি এসে নতুন সরাইয়ের পথের মোড়ে নিয়ম মত থেমে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে সোজা অনন্তের ঘরে এসে বসেছে কৈলাস। গল্প হয়, তর্ক

হয়, সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। তবু কৈলাসকে বসে থাকতে হয়, যতক্ষণ না প্রমীলার রুটী তৈরী সারা হয়। রুটী-গুড় খেয়ে কৈলাস আবার চলে যায়।

এ-পথে আসতে যেতে আর থামতে কোনো বাধা নেই। এমন কি অনন্ত যখন ঘরে থাকে না, তখনো কৈলাস অনায়াসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে এসে বসে থাকতে পারে। সব ভীরুতার সঙ্কোচ পুরানো ধুলো আর ধোঁয়ার মতই উপে গেছে। কৈলাসের বুকের ভেতর সকল শূন্যতা এক মন্ত্রধ্বনির গুঞ্জরণে ভরে আছে।

কোনো ভয় নাই কৈলাসের, কোনো অপরাধের কুণ্ঠা নেই তার মনে। বড় কঠিন পরীক্ষা সহ্য করে, যোগ্য হয়ে, তৈরী হয়ে তবে সে এসেছে।

ধানবাদ ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে আজও যাত্রীর অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় কৈলাসকে। কিন্তু এই সময়টুকুও বৃথা যায় না। সীটের পাশে শিবসংহিতাটী রাখা আছে। স্টিয়ারিংয়ের ওপর শিবসংহিতাখানা খুলে ধরে কৈলাস। মাথাটা ঝুঁকিয়ে এক মনে পড়তে থাকে।

কৈলাসের বেয়াড়া বিবেকটা যেন একেবারে জব্দ হয়ে গেছে। মনের এই ক্ষমাহীন দেবতাটি ভ্রূকুটি করে এখন আর এ-কথা বলতে পারে না—অন্যায় করছো কৈলাস।

কৈলাসের অন্তর জুড়ে এক পরম আশ্বাসের বাতাস বইতে থাকে —হে স্মরহর, তুমি শ্মশানে খেলা করে বেড়াও, পিশাচেরা তোমার সহচর, চিতাভস্ম তোমার অনুলেপ, নরকপালসমূহ তোমার মালা। তোমার আচরণ এই রকমই অপবিত্র। কিন্তু তবুও হে বরদ শিব যে তোমাকে স্মরণ করে তার কাছে তুমি মঙ্গল স্বরূপ!

কৈলাস আশ্চর্য হয়, এর চেয়ে আপন কোন্ দেবতা আছেন? ঘৃণিতের হাত ধরে বুকে টেনে তুলবার জন্য তিনি স্বয়ং ঘৃণার সাজ

পরেছেন। তবু ইনিই তো চন্দ্রোস্তাসিতশেখর, ইনিই তো গঙ্গাফেন-সিতাজটা! এমন দেবতা আর কে আছেন যাঁর নয়নে বহ্নি স্ফুরিত হয়।

চারিদিকে চাঞ্চল্য ও কলরবের মধ্যেও কৈলাস যেন এক নিবিড় প্রশান্তির আস্বাদে মুগ্ধ হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে শিবভক্তের মনের আকাশে একটা নতুন গর্বের ছটা জেগে উঠতে থাকে। রাম-সীতার যুগলরূপের মধ্যে কি এমন বিস্ময় আছে? ভয় পাবার, বিহ্বল হবার, হিংসা করার কি আছে? এর চেয়ে বড় রূপ কি আর নেই?

কৈলাসের বুকের শোণিত হঠাৎ উষ্ণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীর যেখানে যত যুগল মূর্তি আছে, তার সব রূপ রং আর আর আভরণ আজ চূর্ণ হয়ে যাক্। বড় শান্ত, বড় নিষ্ঠুর, বেমানান আর বে-আইনি এই মূর্তিগুলি। শুধু হরগৌরী ছাড়া আর কোনো মিলনের মূর্তিকে আজ পূজো করতে চায় না কৈলাস।

কোথায় তুমি হরগৌরী, পার্বতী পরমেশ্বর! সেই অঙ্গে অঙ্গে বাঁধা রূপ। অর্ধ অঙ্গে কস্তুরীচন্দন. অর্ধ অঙ্গে শ্মশানভস্ম · অর্ধাঙ্গে মন্দারমালা, অর্ধাঙ্গে করোটিমালা—অর্ধাঙ্গে দিব্যাম্বর, অপরার্ধ উলঙ্গ। অর্ধাঙ্গ স্বর্ণ চম্পকের বর্ণ, অপরার্ধ কর্পূরধবল--অর্ধাঙ্গে মেঘশ্যামল কুন্তল, অপরার্ধে বিভূতি-ভূষিত জটা। শিবের অর্ধ এবং শিবার অর্ধ নিয়ে রূপের ঈশ্বর এই মূর্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছেন।

প্রমীলা উপোস করেই দিনটা কাটালো। রাতটাও উপোসে কাটলো। ভোর বেলা গয়া থেকে ফিরলো কৈলাস। হাতে একটা ঠোঙায় কতকগুলি ফুলবেলপাতা আর প্রসাদ। কৈলাসের কপালে একটা ছাইয়ের টিপ গরদের চাদর গায়। শালবনের মাথার ভিড় ঠেলে সূর্য মাত্র ওপরে উঠেছে, কৈলাসের মুখের ওপর আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

কী শাণিত পবিত্র ও ভাস্বর হয়ে উঠেছে কৈলাসের মূর্তিটা। সারা মুখটা ঝকঝক করছে। কৈলাসের দিকে তাকিয়েই অনন্তর বুকটা হঠাৎ টিপ টিপ করে উঠলো। কোথা থেকে একটা ভয়ার্ত্ত স্পন্দন অনন্তের দেহমনে ঠেলে উঠছে—চেষ্টা করেও কিছুক্ষণের মত সুস্থির হতে পারলো না অনন্ত।

প্রমীলাও উঠে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। অনন্ত আবার ভাল করে দেখলো, প্রমীলার মাথার চুলগুলি কত রুক্ষ হয়ে উঠেছে। গায়ে কোনো গয়না নেই, শুধু হাতে দুগাছি চুড়ি। প্রমীলার চেহারাটা যেন কৃশ হয়ে আরও প্রখর হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো এক নতুন অভ্যর্থনার আনন্দে চিক চিক করে হাসছে।

কৈলাস এগিয়ে আসছিল, অনন্ত এগিয়ে যাচ্ছিল। অনেকগুলি প্যাসেঞ্জার বাস মোড়ের ওপর এসে পৌঁছে গেছে। যাত্রীদের কলরব শোনা যায়।

কৈলাসের দিকে তাকিয়ে অনন্ত একটু ব্যস্তভাবেই বললো—শুনলাম, কাল থেকে উপোস করে রয়েছ। একটু জিরিয়ে নাও, না খেয়ে দেয়ে চলে যেও না।

কথাগুলি বলেই অনন্ত যেন ছটফট করে দৌড়ে চলে গেল। মোড়ের কাছে পৌঁছে তার প্রিয় জলসত্রটির কাছে দাঁড়ালো। একটা ঘটিতে জল ঢেলে নিয়ে তৈরী হলো অনন্ত।

তৃষ্ণার্তেরা একে একে ছুটে আসছে। বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী। কেউ অঞ্জলি ভরে জল খায়। কেউ পাত্র পূর্ণ করে নিয়ে চলে যায়। কেউ বা সাহস করে পা ধোবার জন্য লজ্জিতভাবে একটু জল চায়। অনন্ত এক ঘটি জল নিয়ে তার পায়ের ওপরেই ঢেলে দেয়। লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে পা সরিয়ে নিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বলে—থাক থাক। অনন্ত বলে—নাও, আর একটু জল নাও ভাল করে ধোও।

একটা জয়ধ্বনির উল্লাস। সকাল বেলায় শালবনের শান্তি শিউরে দিয়ে একটা ব্যাকুল হর্ষ যেন দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে আসছে। কৌতূহলী হয়ে অনন্তরাম দূর পথের বাঁকের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরেই তাদের দেখা গেল। সড়কের ঢালু ধরে তারা যেন উর্ধ্বলোক থেকে চলে আসছে। দল বেঁধে তারা আসছে। সম্মুখে একটা বড় পতাকা উড়ছে। দু'পাশে শালবনের সবুজ, পায়ের নীচে শিশিরভেজা কালো পীচঢালা পথ, মাথার ওপর নতুন রোদের আভা—তারই মধ্যে এই অভিযাত্রী জনতার খদ্দরের সাজ যেন শুভ্রতায় প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

মোড়ের যাত্রীরা চেঁচিয়ে উঠল—এসে গেছে এসে গেছে। এখানেও তুফান পৌঁছে গেল!

জনতা মোড়ের কাছে পৌঁছে গেল। বার বার জয়ধ্বনি করলো। সবাইকে ডাক দিল—চল চল, সবাই চল।

আজাদীর লড়াই শুরু হয়ে গেছে। জনতা এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলো না। একটা মরণপণ প্রতিজ্ঞা যেন ঝড় হয়ে ছুটে চলে গেল—তসীল কাছারীর দিকে। পরশাসনের যত গ্লানি আর গ্লানির চিহ্নকে আজ ওরা অগ্নিসাৎ করবে। এক যজ্ঞের আগুন জ্বালতে ওরা চলে যাচ্ছে।

জনতা চলে গেল। অনন্তরামের কাণে তখনো জনতার মিলিত কণ্ঠের গানের রেশ যাদুমন্ত্রের মত বাজছিল—জান হাজির হ্যায় অগর্ কর্ দো ইসারা গান্ধী! হে গান্ধী, তুমি যদি মাত্র ইসারা কর, তাহলেই এ প্রাণ উৎসর্গ করতে আমরা প্রস্তুত আছি।

এ যে তার রামচরিতমানসের বাণী! কত বার কী নিবিড় বিশ্বাসে, কি শ্রদ্ধাললিত স্বরে এই আত্মদানের গান গেয়েছে অনন্তরাম।

হ্যাঁ, শুধু গান গাওয়াই সার হয়েছে। কিন্তু দেখে হিংসে হয়, এই

জনতা যে নিজেরাই গান হয়ে গেছে। গান্ধীজী, গান্ধীজী—রামজীর আত্মাটি বুঝি নতুন করে আবির্ভূত হয়েছেন। কী ভাগ্যবান তারা, যারা তাঁর পুণ্য স্পর্শ পেয়েছে, তাঁর বাণীতে আত্মহারা হয়ে গেছে।

অনন্তরামের প্রতিদিনের অভ্যস্ত কাজের জীবনটা যেন আজকের ঝড়ে শুকনো ডালপালার মত ভাঙবার আগে মড়্মড়্ করে বেজে উঠলো।

তবু কাজ করে যায় অনন্ত। মোটর বাস, মোষের গাড়ি এসে মোড়ের ওপর থামে। পালকি থামিয়ে ক্লান্ত বেহারার দল হাঁপায় আর হাওয়া খায়। দোকানের চৌকীতে বসে অনন্তরাম বিক্রী করে—আটা ছাতু কেরোসিন কুইনিন, আমলকীর আচার, ভাস্কর লবণ, হরধনুর্ভঙ্গের ছবি। এই বিকিকিনির তুচ্ছ সংসার ক্রমেই নিরাস্বাদ হয়ে আসছে, মোটেই ভাল লাগে না। তবু যেন অন্যমনস্কের মত এই ধরাবাঁধা কাজের ওপর শুধু হাত ছুঁইয়ে চলে যায় অনন্ত, শুধু নিজের মনকে হাতের কাছে পায় না।

জীবনে এই প্রথম, এক নিঃস্বতার অভিমানে অনন্তরামের চিরকেলে আশা-বিশ্বাসের সত্তাটি যেন কুণ্ঠিত হয়ে রইল। রামচরিত-মানস তো পরশমণি, যার ছোঁয়ায় সব ভাবনা সোনা হয়ে যায়। কিন্তু কই? মন যে তার ধুলো হয়ে ঝরে পড়ছে। যেন ঘুণ ধরে গেছে।

কংগ্রেস জিন্দাবাদ! আর একটা জয়রোলের স্রোত পথের ওপর আচমকা কোথা থেকে এসে গড়িয়ে পড়ে। বিহ্বলের মত অনন্তরাম পথের মোড়ে তাকিয়ে থাকে, জনতার উল্লাস যেন নতুন সরাইয়ের সকল দীনতার ধুলিসজ্জাকে মুছে দিয়ে চলে যায়। ধীরে ধীরে মোড়ের ওপর একটা ভিড় জমে উঠতে থাকে। অনন্ত দেখতে পায়—ঐ রঘুনাথ আহীর, ঐ বুড়ো মাহাতো কাশীনাথ। ঐ যে তাদেরই সঙ্গে

রাজপুত বাড়ীর সব ছেলেগুলিই এসে দাঁড়িয়েছে। আরও আসছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড! যেখানে শুকনো ডাঙ্গা ছিল, হঠাৎ কোন প্লাবনে সেখানে যেন জলে ভরে উঠলো। আরও দেখতে পাওয়া যায়, সেই জলে ঢেউ জাগছে, মত্ত ফেনিল ঢেউ। নয়া সরাইয়ের জনতা নীল আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে জয়ধ্বনি করলো—স্বতন্ত্র ভারত কি জয়!

অনন্তরাম জানে, লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কী মনোমোহন এই লড়াইয়ে রূপ! স্তবে গানে শুচিতায় ও শুভ্রতায় এক অনুপম উৎসবের মত।

অনন্তরাম তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে ফেলতে চায়। ওরা যেন চলে না যায়। একটু অপেক্ষা করুক। আর কিছুক্ষণ। আর একটু সময় দিক অনন্তরামকে। মন স্থির করে নিক অনন্তরাম। কিসের এক ভীরুতায় কেমন এক লজ্জায় কতগুলি একেবারে নতুন অভিমানে ও মায়ায় তার মন আজ এই ঘরের ভেতরেই যেন হারিয়ে গেছে। ছুটে চলে যাবার আহ্বান পৌঁছে গেছে, সম্মুখে কোন বাধা নেই। এক অবারিত ও আলোকিত পথ। তবু…

তবু পেছন থেকে যেন একটা অন্ধকারের শিকল অনন্তরামের পাদুটোকে জড়িয়ে ধরেছে। প্রমীলাকে চিনতে পারা গেল না, আরও দুর্বোধ্য কৈলাস। আজ ওরা শুধু একবার অনন্তরামের সম্মুখে এসে দাঁড়াক, স্পষ্ট করে নিজের মুখেই বলে দিক, ওরা কে? তারপর আর কোনো বাধা থাকবে না অনন্তরামের। পথের মোড়ে ত্রিবর্ণ পতাকা দুলছে, এক দৌড় দিয়ে এই রঙীন যুদ্ধের আঙিনায় ছুটে চলে যেতে পারে অনন্ত।

ঘরের ভেতর থেকে ব্যস্তভাবে বের হয়ে এল প্রমীলা—ভাল ধূপ আছে?

অনন্ত—কেন?

প্রমীলা—পাঠ শুরু হয়েছে, ধূপ শেষ হয়ে গেছে, আরও চাই।

অনন্ত—কিসের পাঠ ?

প্রমীলা—কৈলাস ভাই শিব স্তোত্র পড়ছে। তুমিও এস, একবার শুনে যাও, কি সুন্দর পড়ছে কৈলাস ভাই।

এক মুঠো ধূপ তুলে নিয়ে প্রমীলার দিকে এগিয়ে দিল অনন্ত। তার পরেই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ধূপ হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে চলে যেতে গিয়েই প্রমীলা থমকে দাঁড়ালো। এক পা দু'পা করে এগিয়ে এসে অনন্তরামের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। অনন্ত আশ্চর্য হয়ে প্রমীলার দিকে মুখ ফেরাতেই দু'হাত দিয়ে মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরলো প্রমীলা—এত গম্ভীর হয়ে বসে আছ কেন ? কি হয়েছে ?

অপরাধীর মত সঙ্কোচে হঠাৎ বিব্রত হয়ে অনন্ত উত্তর দিল—না, না, সত্যিই কিছু হয় নি।

প্রমীলা হেসে হেসে চোখ দু'টো বড় করে নকল শাসনের ভঙ্গীতে বললো—সত্যি বলছো তো ?

অনন্ত—হ্যাঁ।

ব্যস্তভাবেই আবার ঘরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল প্রমীলা।

ধীরে ধীরে একটা স্বাচ্ছন্দ্যের টানে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে পায়চারি করে অনন্ত। বুকের ভেতর যেন এতক্ষণ একটা নির্লজ্জ অবিশ্বাসের বাতাস আটকে ছিল। মনের কপাট খুলছে, বদ্ধ হাওয়ার গ্লানি উড়ে সরে যাচ্ছে। প্রমীলাকে একবার ডাকতে ইচ্ছে করছিল অনন্তরামের।

কেন ?

প্রশ্ন করলে এখনো ঠিক উত্তর দিতে পারবে না অনন্ত। নিত্য দোকানদারীর স্থাবর জীবন যেন নিছক সুস্থিরতার পাপে মরচে ধরে

গেছে। ওদিকে রামচরিতের সব মহিমা আজ পুঁথির বন্ধন ছিঁড়ে হিন্দুস্থানের আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। ঐ শালবনের চঞ্চল সবুজে, ঐ ঘূর্ণিহাওয়ার আবেগে, ঐ জয়ধ্বনির গর্বে। প্রমীলাকে একবার আশীর্বাদ করতে চায় অনন্ত।

কেন?

এখনো স্পষ্ট বুঝতে পারে না অনন্ত। মোড়ের ওপর জনতার সামনে দাঁড়িয়ে রাজপুতবাড়ির সব চেয়ে ছোট ছেলেটা বক্তৃতা করছিল—এই ঝাণ্ডা আর এই বুক, এই আমাদের সম্বল। বাস্ এইবার আমরা রওনা হয়ে যাই। এই ঝাণ্ডার গায়ে আমাদের বুকের রক্তের ছিটে লাগবে। স্বরাজ নিতে হবে, আজ প্রাণের হিসাব করতে নেই। চলো চলো চলো...

চলে যেতেই হবে। অনন্তরাম যেন এতক্ষণে মনের ভেতর একটা প্রশ্নের উত্তর শুনতে পায়। কিন্তু, কিন্তু আরও অনেক প্রশ্ন যে রয়ে গেল। এখনো উত্তর পাওয়া গেল না!

যাবার আগে রামচরিতখানা আর একবার কোলের উপর তুলে নিল অনন্তরাম। যাত্রার আগে যেন এক রত্নপেটিকা খুলে তার পথের সম্বল বেছে বেছে তুলে নিচ্ছে।

গুন্ গুন্ করে পড়তে থাকে অনন্ত, যেন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন সুর—

রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা
চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা

রামচন্দ্র তুমি সমুদ্রের মত, সজ্জনেরা মেঘ। হে রাম তুমি চন্দন তরু, সজ্জনেরা বাতাস।

হ্যাঁ, মোড়ের উপর জনতার মূর্তি প্রতিজ্ঞায় গম্ভীর হয়ে উঠেছে—ওরা মেঘের মত। হ্যাঁ, কোথাও যেন চন্দন তরুর মাথায় ঝড়ের মন্ত্র লেগেছে, ওরা বাতাস হয়ে ছুটে যাচ্ছে!

মনে মনেই প্রমীলাকে আশীর্বাদ করে অনন্ত। তাকে চিনতে পারে নি অনন্ত, বড় ভুল হয়েছিল। মন বড় নোংরা হয়ে গিয়েছিল। বড় অহঙ্কার ছিল মনে মনে। আজ হৃদয়ের সব বিশ্বাস সঁপে দিয়ে অনন্ত পড়তে থাকে—

ভয়উ মনোরথ সুফল তব
শুনু গিরিরাজকুমারী
পরিহরু দুসহ কলেস সব
অব মিলিহহিঁ ত্রিপুরারি।

গিরিরাজকুমারী শোন, তোমার ইচ্ছা সফল হয়েছে। এখন সকল দুঃসহ ক্লেশ ছেড়ে দাও, শিবকে পাবে।

তাড়াতাড়ি পুঁথির পাতার পর পাতা উল্টে যায় অনন্ত। রামজীর কৃপা যেন তার জীবনে এতদিনে সত্য হয়ে উঠেছে। সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে, সব সংশয় একে একে দূরে সরে যাচ্ছে—

…ভরত হৃদয় সিয়া রাম নিবাসূ
এহঁ কি তিমির জহঁ তরণি প্রকাসূ

ভাই ভরতের হৃদয়ে সীতারাম বাস করে। সেখানে সূর্য আছে, সেখানে কি অন্ধকার থাকতে পারে ?

কৈলাস ভাই। আবেগ রোধ করতে না পেরে চেঁচিয়ে ডাকতে যায় অনন্ত। ছি ছি, কী ভয়ানক ভুল কী নোংরা মনের প্রবঞ্চনা! ভাই ভরতকে এতদিন চিনতে পারে নি অনন্ত।

অনন্তের চেয়ে বেশী সুখী কেউ নেই। তার সীতা আছে, ভরত আছে। অন্ধ হয়েছিল বলে এতদিন দেখতে পায় নি, তার ছোট সংসারে রামচরিতের পুণ্য জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! পথের মোড়ে আর একটা ধ্বনি, আর একটি জনতা, আর একটা নতুন জলপ্রপাতের হর্ষ!

অনন্তরামের গলার স্বরও নতুন এক আবেগের বন্যায় একেবারে ভেসে যায়—

...রাম কাজ কারণ তনুত্যাগী
হরিপুর গয়উ পরম বড় ভাগী।

রামের কাজে জীবন বলি দাও। তুমি হরিধামে যাবার মত পরম ভাগ্য লাভ করবে।

রামচরিতখানা বন্ধ করে রেখে দোকানের চৌকী থেকে একটা লাফ দিয়ে নেমে পড়ে অনন্ত। খড়ম জোড়া পরে নিয়ে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড় দেয়। পথের মোড়ে পৌঁছে যায়। ত্রিবর্ণ পতাকার প্রমত্ত ছায়া অনন্তরামের মাথার ওপর যেন এক চরম আবদারের দাবীতে হুটোপুটি করতে থাকে।

শিবপুরাণের একটা অধ্যায় পড়ছিল কৈলাস। ঘরের ভেতর একটা জায়গা পরিষ্কার করে নিকিয়ে দিয়েছে প্রমীলা। তারই ওপর আসন পেতে কৈলাস শান্তভাবে বসেছিল। সামনে একটু তফাতে মুখোমুখি বসেছিল প্রমীলা। ঘরের ভেতর রোদের আলো এসে পড়েছে, তবু একটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছিল। ধূপ পুড়ছিল। প্রদীপ শিখার চঞ্চলতায় একটা দুঃসহ পবিত্রতার জ্বালা যেন স্বর্ণাভ ছায়ার মত কৈলাসের চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল।

কৈলাস পড়ছিল—সেই মহাদেবই ভাস্কর, সেই মহাদেবীই প্রভা। এই শঙ্কর-শঙ্করীই আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও বেলা, বৃক্ষ ও লতা...

প্রমীলা হঠাৎ অনুরোধ করে—একটু থামুন কৈলাস ভাই। আমি এখনি আসছি।

পড়া থামিয়ে কৈলাস বলে—কেন?

প্রমীলা ব্যস্তভাবে দাঁড়িয়ে বলে—জল ফুটছে, ডাল ছেড়ে দিয়ে

আসি, নইলে রান্না দেরী হয়ে যাবে। ডাকগাড়ী এসে গেলে ওর আবার খাবার সময় হবে না।

প্রমীলা চলে যায়। কৈলাস বইটা একেবারে বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে! একমুঠো ধুপের গুঁড়ো নিয়ে আগুনের সরার ওপর ছড়িয়ে দেয়। ভুর ভুর করে সুরভিত ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস আচ্ছন্ন হতে থাকে। কৈলাসের মূর্তিটা যেন তার মধ্যে অত্যন্ত অবাস্তব ও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসে প্রমীলা। নিজের জায়গাটিতে বসে। আগ্রহ করে বলে—পড়ুন।

শিবপুরাণের অধ্যায়টা খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগে কৈলাসের, হাতটা অকারণে কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ প্রমীলার দিকে চোখ তুলে তাকায় কৈলাস। দৃষ্টিটা বড় প্রখর, শিবভক্তেরও চোখে যেন আগুনের আভা ঝলকায়।

কৈলাস বলে—শিবের আরাধনায় কোন ফাঁকি রাখতে নেই প্রমীলা।

তারপরেই পড়তে আরম্ভ করে কৈলাস—যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, আকাশ নহেন। যাঁর তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই, গ্রীষ্ম নেই, শীত নেই। যাঁর দেশ নেই, ঘর নেই, সেই শিবকে···

কৈলাসের গলার স্বর যেন এক কান্নার আবেগে ভেঙে পড়তে চায়। প্রমীলা স্থির দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকে, পাঠ শোনে।

কৈলাস যেন ব্যাখ্যা করার জন্যই বলে—তার কিছু নেই প্রমীলা! সে একেবারে শূন্য।

প্রমীলা বলে—পড়ুন।

কৈলাস পড়ে—সে শুধু বিষপান করে, তাই সে নীলকণ্ঠ। সাপ

তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। তবু তারই বাম অঙ্গের শোভা হয়ে রয়েছেন স্বয়ং পার্বতী।

পড়তে পড়তে কৈলাস হঠাৎ থেমে যায়। অনেকক্ষণ মুখ নীচু করে বসে থাকে।

প্রমীলা বলে—পড়ুন।

কৈলাস তাকায় প্রমীলার দিকে। অন্তরের সমস্ত বিশ্বাস চরম আবেদনের মত ফুটে ওঠে; বুকভরা আগ্রহ নিয়ে কৈলাস ডাকে—কাছে এস প্রমীলা! পাশে বসো।

প্রমীলা সেইখানেই নিশ্চলভাবে বসে থেকে বলে—পড়ুন।

একটা ধোঁয়ার পুঞ্জ কৈলাসের মুখের ওপর দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসের মূর্তিটাকেও বদলে দিয়ে গেল। যেন কৈলাসের মাথায় আগুন ধরে গেছে। মুখটা একেবারে কালো হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিটা নীরব হাহাকারের মত, এক রিক্ত জগতের চারদিকে অসহায়ের মত ছুটাছুটি করছে।

এত সেয়ানা শক্ত মানুষ কৈলাস যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। আবোল তাবোল বকছে—আমি শিবের পূজো কেন করি, তা আমি নিজেই জানি না প্রমীলা। বোধ হয় জীবনে কোনো গৌরীর মূর্তিকে স্বচক্ষে দেখতে পাব, সেই লোভে···

প্রমীলার নিশ্চল মূর্তিটা যেন একটা আঘাত লেগে আচমকা নড়ে উঠলো। তার পরেই আবার স্থির হয়ে রইল।

কৈলাস বলে—দেবতা হোক আর মহাপুরুষ হোক, জীবনে কারও গৌরীলাভ হয় না জানি। মহাদেবও গৌরীর অর্ধেকটুকু পেয়েছিলেন প্রমীলা। আমি কোন ছার!

চিরকালের বোকা মেয়ে প্রমীলা চমকে উঠলো। মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

কৈলাস যেন বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে একেবারে পাগল হয়ে গেছে—অনন্ত ভাইয়ের কাছে আমি কোনো দোষ করতে চাই না প্রমীলা, তার কিছুই কাড়তে চাইনা। আমি চোর নই।

মাথা হেঁট করেই ভয়ার্ত স্বরে প্রমীলা বলে—তবে আপনি কি?

কৈলাস—আমি ভক্ত। সত্যিই আমি শুধু ভক্ত, প্রমীলা। শিব আমার ভরসা।

প্রমীলা—আপনার কথা বুঝতে পারছি না, কৈলাস ভাই।

কৈলাস—শুধু তোমার ভালবাসার অর্ধেকটুকু প্রমীলা।

প্রমীলা মুখ তুলে তাকালো—কি বললেন?

কৈলাস—আমার যেটুকু পাওনা, তাই বললাম।

প্রমীলা আর মাথা হেঁট করলো না। যেন একটা জ্বালার আঁচ লেগেছে, চোখ তুটো বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে প্রমীলা।

প্রমীলার চোখ নিংড়ে বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। হঠাৎ ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালো কৈলাস। কোথায় গৌরী? গৌরীরূপের কোন চিহ্ন নেই এই মেয়ের মুখে। আকুল হয়ে কাঁদছে, এ যে সীতার মুর্তি। অতি বোকা, অতি ছিচকাতুনে অথচ অত্যন্ত ঢিট মেয়ে এই রামায়ণের সীতা।

একটা তাচ্ছিল্যের ঠেলা দিয়ে শিবপুরাণ পাশে সরিয়ে রাখলো কৈলাস,এই ব্যর্থ অপদার্থ মন্ত্রের জঞ্জাল। একটা ছলনার সিঁড়ি, মানুষকে ঝুটা দেবত্বের গাছে তুলে দিয়েই দূরে সরে যায়।

পালিয়ে যাবার আগে প্রমীলার সামনে একবার দাঁড়ালো কৈলাস। কৈলাসের হাত-পা কাঁপছে। শুধু একটা কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে কৈলাস বুঝলো—গলা কাঁপছে।

আর মুহূর্ত্ত দেরী করলে না কৈলাস। ভেতর ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে দোকান ঘর। তারপরেই ছোট মাঠের ওপর

দিয়ে এক দমে হন্ হন্ করে হেঁটে পথের মোড়ে এসে পৌঁছাল কৈলাস।

একেবারে নির্জন হয়ে রয়েছে মোড়াটা। কোনো সাড়া শব্দ নেই। বস্তির ঘরগুলির কপাট বন্ধ। কোনো গাড়ী দাঁড়িয়ে নেই, গাড়ীর চলাচলও নেই। নতুন সরাইয়ের জীবনের সাড়া যেন শালবান ভেদ করে দুরান্তরে পালিয়ে গেছে। এক বৈরাগীর ছাড়াভিটার মত নতুন সরাইয়ের শব্দমুখর পথের মোড় আরও গভীর শূন্যতায় উদাস হয়ে রয়েছে।

তসীল কাছারির ফটকটা কেল্লার দরজার মত। কাছারির চারিদিকে বেঁটে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একটা কাঁচা সড়ক নানাদিক ঘুরে ফিরে ফটকের কাছে এসে শেষ হয়েছে, প্রাচীরে ঘেরা এই ভূখণ্ডের ওপর ছোট ছোট সবুজ ঘাসের আঙিনা আর কাছারি ঘর। শুধু তসীল কাছারি নয়, কাছাকাছি আশেপাশে এক সৌভ্রাত্রের আবেগে অনেকগুলি অফিস দাঁড়িয়ে আছে। একটা খাজনাখানা আর জঙ্গল অফিস, একটা আবগারী অফিস, একটা ডাকঘর। ছোট একটা কৃষি অফিসও আছে—একটা অকেজো ট্র্যাক্‌টরের মরচে-পড়া কঙ্কাল কাৎ হয়ে পড়ে আছে সম্মুখের ঘাসের ওপর। ফটক পার হয়ে প্রথম দালান হলো থানাবাড়ি। ছোট ছোট অফিস আর ছোট ছোট আমলা, কিন্তু খুব বড় বড় কাজ হয়। এক বছরের ঘুষের টাকা এক সঙ্গে জমা করলে ইঁটের বদলে তাই দিয়ে আর একটা পাঁচিল তোলা যায়। সার্কেলের পেয়াদাটার মুখে শুধু একটু খুশি মেজাজের হাসি ফুটিয়ে তুলতে হলেও চার আনা ঘুষ দিতে হয়। কথা বলাতে আট আনা—আর দরখাস্ত-টেবিলের ওপর পৌঁছে দিতে এক টাকা। কয়েকটা গাঁ ডিহি বস্তি আর সরাই, কয়েকটা জঙ্গল পাহাড় ঝর্ণা আর ক্ষেত, কয়েক হাজার দীন মানুষের পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখ শোক ও উৎসবের মধ্যে নিতান্ত অবান্তর এই তসীল কাছারি। তারই ফটকে কয়েক শত মানুষ আজ

হানা দিয়েছে, যেন এক দুঃস্বপ্নের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে, হিসেব নিকেশ করতে।

সমস্ত কাছারি বাড়িটার পাগড়ী আর উর্দি গরম হয়ে উঠেছে। লাঠিধারী পুলিশেরা সার বেঁধে পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যেন পাঁচিল টপকে কেউ ভেতরে না ঢুকতে পারে। ফটকের পথ রুখে প্রথম দফায় দাঁড়িয়ে ছিল একদল গুর্খা সৈনিক, সঙ্গে একজন গোরা মেজর। টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র চটপট মোটর লরী দাবড়িয়ে চলে এসেছে। সদর থেকে এক রায় বাহাদুর এস-ডি-ও পত্রপাঠ চলে এসেছেন। ভুড়ির ওপর বেল্ট, বেল্টের সঙ্গে রিভলভার। ভুড়িতে যতই স্নেহপদার্থ থাকুক রিভলভারটি একেবারে স্নেহবর্জিত। থানা-ইনচার্জ দারোগাবাবু হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছেন।

মাত্র তিন শত গ্রাম্য মানুষের একটা জনতা। কারও হাতে একটা লাঠিও নেই। মনের ভুলে লাঠি ছেড়ে দিয়েছে তা নয়, ইচ্ছে করেই ওরা আজ লাঠি ছোঁবে না। কারও মাথার খুলি ভাঙতে ওরা আসে নি। ওদের দাবীটা বড়ই অদ্ভুত। শুনতে খুবই সামান্য, বলতে খুবই সোজা, বলছেও খুব স্পষ্ট করেই। কিন্তু ভাবতে বড় ভয়ানক! এক চরম বিপর্যয়ের মন্ত্র যেন ওদের দাবীতে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তসীল কাছারির সমস্ত নথিপত্র, কয়েক শত বছরের যত অপমানের ইতিহাসকে আজ শুধু ওরা হাতের মুঠোয় পেতে চাইছে। এই নথিপত্র নিয়ে ওরা চলে যাবে, কোন্ এক অলক্ষ্য বৈতরণীর জলে চিরকালের মত ভাসিয়ে দেবে কে জানে?

সবচেয়ে আশ্চর্য, অস্ত্রে আয়ুধে ও হিংস্র দম্ভে কণ্টকিত এই ফটকের মুখেই এসে ওরা ভিড় করেছে। থরে থরে সাজানো এই মৃত্যুর ভ্রূকুটী ভেদ করে, এই পথেই ওরা কাছারি এলাকায় ঢুকতে

চায়। পাঁচিল টপকে ভেতরে যাবার কোনো স্পৃহা নেই কারও মনে। সস্তা পথে কোনো লোভ নেই, চালাকির কেউ ধার ধারে না। ওরা ফাঁকির তক্ষক নয়। পিস্তল বন্দুকের ঔদ্ধত্যকে অবাধে তুচ্ছ করে, এই দুঃস্বপ্নকে বিদ্রূপে ব্যর্থ করে দিয়ে ওরা চলে যাবে। তাই ওরা এগিয়ে যাবে। এগিয়ে চললো।

থানার জমাদার গর্ গর্ করে গলার রগ কাঁপিয়ে হুঁসিয়ারী চীৎকার ছুড়লো—হঠ্ না হ্যায় তো হঠ্ যাও, নেহি তো মর যাওগে।

ঝটপট সঙ্গীন চড়িয়ে গুর্খা রাইফেলস্ শক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

—হঠ্, যাও হিন্দুস্থানসে! মত্ত ঝড়ের গর্জনের মত প্রত্যুত্তর দিয়ে জনতা ফটকের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

—হঠ্ না হ্যায় তো হঠ্ যাও, নেহি তো মর যাওগে। আবার সেই গলার শিরা কাঁপানো মৃত্যুর হুংকার।

টোটাভরা রাইফেলগুলি নিশানা ক'রে যেন ফণা তুলে স্থির হয়ে রইল।

—করঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! নবীন মেঘের ভেরীর মত জনতার সংকল্প আবার বেজে উঠে প্রত্যুত্তর দেয়।

এস-ডি-ও অর্ডার হাঁকলেন—ফায়ার!

এক রাউণ্ড ছররা গুলী বারুদের গন্ধ উড়িয়ে সশব্দে ছিটকে পড়লো। জনতা যেন আচম্কা ছন্নছাড়া হয়ে সড়কের উল্টো দিকে বহু দূর পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। কেউ পথের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপলো, কেউ হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল, কেউ আতঙ্কে দৌড় দিল।

বারুদের প্রথম দফা ধোঁয়া আর গন্ধ মিটে যেতে না যেতেই এই পিছে-হঠে-যাওয়ার দৃশ্যের মধ্যে মাত্র একটি বেপরোয়া আত্মা ফটকের উপর হানা দেবার জন্য একলা ছুটে এগিয়ে গেল।

—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! করেঙ্গে ইয়া—

অনন্তরামের মন্ত্রের অনুচ্চারিত সংকল্প পূর্ণ হলো। মেজরের রিভলভারের গুলি এক নিমেষে ছুটে এসে অনন্তরামের বুকের পাঁজর ফুটো করে দিয়েছে।

কয়েকটি মুহূর্তের মত, এক স্পন্দনহীন মূক পৃথিবীর স্তব্ধতার মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে ছট্‌ফট্‌ করে নিজে রঙীন হয়ে উঠলো অনন্ত, মাটি রঙীন হলো।

এর পরের ঘটনার হিসেব অনন্তরাম জেনে গেল না। সবার আগে কারও কাছে বিদায় না নিয়েই সে চলে গেছে। কিন্তু ঐ জনতাই অনন্তরামকে বিদেয় দেবার জন্য কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এসে তসীল কাছারির ফটকে দাঁড়িয়েছে। লাঠি তরবারি বল্লম বন্দুক ইট পাটকেল চালিয়েছে। প্রাণ দিয়েছে, প্রাণ নিয়েছে। তসীল কাছারির ফটকে শোণিতের উৎসব কিছুক্ষণের জন্য ভয়াল হয়ে উঠেছে। সমস্ত কাছারি এলাকা আগুনে পুড়ে গেছে। শুধু দালানের কালো কালো দেয়ালগুলি বিধ্বস্ত প্রেতালয়ের চিহ্নের মত দাঁড়িয়ে থাকে। অঢেল ফুলের স্তবকে শবাধার সাজিয়ে অনন্তরামকে তারা তুলে নিয়ে চলে যায়।

তসীল কাছারির ফটকে ঐ যে এক খণ্ড ভূমি, অনন্তরাম যার মাটিকে রঙীন করে দিয়ে গেল—সেই মাটিই এক এক খাব্‌লা লোকে তুলে নিয়ে গেছে। শক্ত পাথুরে মাটি, লোকে জল ঢেলে নরম করে নিয়ে এক এক মুঠো কাদা নিয়ে যায়, এক মুঠো পুণ্যের পরমাণু।

শোণিত আর আগুনের খেলা থেমেছে। কিন্তু সকাল সন্ধ্যে লোক আসছে তসীল কাছারির ফটকে, এ গাঁ থেকে, ও গাঁ থেকে—ভিন্ন জেলার বাজার ও বস্তি থেকে—মাটি নিতে। শুধু এক মুঠো মাটি।

পোড়ো কাছারির ফটকে দিনকয়েক পরে আবার দেখা দিল পুলিশ আর ফৌজের লোক। আর পাহারা দেবার মত কিছু নেই। কিন্তু বাধা দেবার মত আর একটা কাজ তারা পেয়ে গেছে। ঐ এক খণ্ড ভয়ানক জমির মাটিকে তারা ঘিরে ধরলো—কেউ মাটি নিতে পারবে না।

সত্যি কেউ মাটি নিতে পারে না। লোকে একটু দূরে দাঁড়িয়েই আগ্রহে তাকিয়ে থাকে। তারপর হতাশ হয়ে চলে যায়।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন—সপ্তাহ কেটে যায়। তারও পরে শালবনের মাথার ওপর দিয়ে প্রতি রাত্রিতে কৃষ্ণা তিথির ক্ষীণ চাঁদের রূপ ধীরে ধীরে ভরে উঠতে থাকে। হঠাৎ একদিন ভোরের আলোকে দেখা যায়, ঐ একখণ্ড মাটির গায়ে সবুজ ঘাসের আবির্ভাব সাড়া দিয়ে উঠেছে। পুলিশ আর ফৌজের মানুষগুলিকে হঠাৎ দেখতে নতুন রকমের লাগে। যেন তীর্থ ভূমির পবিত্রতাকে ওরা পাহারা দিয়ে সযত্নে আগলে রেখেছে। ওরা এখনো জানে না যে, ভবিষ্যতের কোনো পথিক হয়তো দেবালয় দেখবার জন্য ঠিক এইখানে, এই ভয়ানক মাটির কাছে এসে, এমনি এক সকালবেলায়···

এমনি এক সকালবেলায় মাত্র কয়েকটা দিন পরে তীর্থযাত্রীর মতই কয়েকটি মানুষ হেঁটে হেঁটে তসীল কাছারির ফটকের প্রায় কাছাকাছি কাশফুলে ছাওয়া মাঠের ওপর এসে দাঁড়ালো। প্রমীলা, প্রমীলার বাবা নন্দলাল, প্রমীলার ছোট ভাই বাসুদেব আর কৈলাস।

কি দেখতে ওরা এসেছে তা নিজেরাই ভাল করে জানে না। তবু ওরা তাকিয়েছিল ফটকের দিকে। বুড়ো নন্দলালের একজোড়া হতভম্ব চোখ জলে ভিজে গিয়েছে। লক্ষ বছরের ধৈর্যে কঠিন, পিতা হিমাদ্রির বুকের বরফে আবার নতুন করে পুত্রশোকের জ্বালা লেগেছে।

ছোট ছেলে বাসুদেব কান্না লুকোবার জন্যেই যেন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হিন্দুস্থানের দেবদারু বনের একটি শিশু-ঝড় হঠাৎ বড় আকাশের মেঘের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে জলের ঝাপ্‌টা লেগেছে, ভাল করে বুঝতে পারছে না বলেই যেন অভিমান হয়েছে।

সবার পেছনে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল কৈলাস।

শুধু কাঁদতে পারলো না বিধবা প্রমীলা। প্রমীলা যেন এক তপস্বিনী সিদ্ধার্থিকার সত্তা লাভ করেছে। জীবনের এত বড় ক্ষতিটার হিসেব খতিয়ে দেখবার কোনো গরজ নেই। কোনো দুঃখকেই আজ যেন আমল দিচ্ছে না প্রমীলা। কেমন দেবী-দেবী ভাব। যেন একটা চন্দন-চর্চিত কঠিন আত্মাভিমানের মূর্তি। যাবার আগে একটা ,মুখের কথা পর্যন্ত না বলে যে চলে গেল, তার দেওয়া শাস্তি সে নিশ্চয় গ্রহণ করবে। কিন্তু কেঁদে কেটে নয়, হেসে হেসেও নয়—একেবারে শূন্য হয়ে গিয়ে। এই কয়টা দিন, সকাল সন্ধ্যা ও রাত্রি, শুধু গভীর বিশ্বাসে শিবনাম জপেছে আর শিবস্তোত্র পড়েছে প্রমীলা। শূন্যতার ভগবান তাকে কৃপা করে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঘরে ফেরবার আগে প্রমীলা একবার কৈলাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো—আর কাঁদবেন না কৈলাস ভাই।

এই সান্ত্বনাকে সইতে না পেরেই কৈলাস যেন অভিমানী ছেলেমানুষের মত আরও বেশী আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করলো—আমি শিবভক্ত প্রমীলা বহিন্‌। তুমি বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই ভক্ত, শুধু ভক্ত।

তপস্বিনীর হৃদয়ভরা শূন্যতার গায়ে নেহাৎ অসাবধানেই যেন এক টুকরো মেঘের সজলতা লাগে। প্রমীলার গলার স্বর আর

একবার যেন ভুল করে মমতার ছোঁয়ায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে—হ্যাঁ কৈলাস ভাই।

কৈলাস—তাই তো আমি শিবালয় দেখতে এখানে এসেছি।

শিবালয়! প্রমীলার শুকনো চোখের দৃষ্টি তসীল কাছারির ফটকের একখণ্ড ঈষৎ শ্যামল মাটির বেদীর ওপর গিয়ে লুটিয়ে পড়লো। দু'টো পুলিশ তখনো জায়গাটা পাহারা দিচ্ছে। লম্বা লম্বা লাঠির ছায়া পড়েছে মাটির ওপর।

প্রমীলাদের সামনে অনেকগুলি কৌতূহলী পথচারী লোক একটা বিস্ময়ের ভিড় সৃষ্টি ক'রে দাঁড়িয়েছিল। তারা শুধু বুঝতে চেষ্টা করছিল—কে এরা?

হঠাৎ বুকফাটা শোকের বিলাপ বাতাসে ছড়িয়ে, সুর করে টেনে টেনে, মাথা কুটে, ক্ষমা চেয়ে, কেঁদে উঠলো প্রমীলা। গৌরী নয়, সীতাও নয়। কৌতূহলী জনতা শুধু বুঝতে পারলো, নতুন সরাইয়ের অনন্ত মুদীর বউ কাঁদছে।
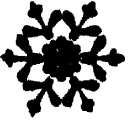
গল্পালোক | গ্রাম-যমুনা

কত রকমের পরব ও উৎসব আছে ; কিন্তু হোলির মত কোনটি নয়। চম্পূগাঁয়ের চামারেরা একথা ভাল করে জানে।

ক'মাস আগেই গেছে নাগপঞ্চমী ; সকাল থেকে মেয়েরা ঘরদোর পরিচ্ছন্ন করেছে। দেয়ালগুলি নতুন করে গোবরমাটি দিয়ে নিকিয়ে, চুন গুলে বড় বড় সাপের মূর্তি এঁকেছে তার ওপর ! প্রায় সারা গাঁয়ের নরনারী শিশু পাতকুয়োগুলির কাছে ভিড় করে স্নান করেছে, মাটির তেলাইয়ে সিঁদূরের ফোঁটা লাগিয়ে ও দুধে পূর্ণ করে ঘরের বাইরে রেখে দিয়েছে। সকালে ভক্তিভরে প্রণাম করেছে শ্রীনাগের সেই নৈবেদ্যের সামনে। বাস্তু সাপের গর্তে ভাত ঢেলে দিয়েছে তারা। সারাদিন মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে গান গেয়ে শ্রীনাগের কৃপা প্রার্থনা করেছে। খয়ের গাছের ডাল দিয়ে ঘরের চারদিকে গণ্ডী দেগে দিয়েছে, ভবিষ্যতে কোনো সাপ সেই গণ্ডী লঙ্ঘন করে তাদের সুখের নীড়ে বিষ ছড়াতে আসবে না।

তারপর সন্ধ্যেও হলো, চম্পুগাঁয়ে ভরাবর্ষায় মেঘের ঘটা অন্ধকার ঘনিয়ে আনলো। বর্ষণে প্লাবনে ছোট্ট চম্পূগাঁ যেন গলে যাচ্ছে। অদূর ফল্গুর বুকে ঢল নেমেছে—জলের তোড়ের জ্বলে ওঠে—গোঙানি শোনা যায়। তবু সেবক মাহাতোর ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ ঢোলের শব্দ গুমরে ওঠে। পানভোজন আর হাসিখুশির কলরব, নাগপঞ্চমীর উৎসবের কোনো ব্যতিক্রম হয় না। পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ কাজ্‌রি গায়। মেয়েরা দল বেঁধে গান করে।

উৎসবে গাঁয়ের প্রায় সকলেই উপস্থিত। শুধু আসে নি সাধু চামার। তাকে কেউ আসতে আহ্বান অনুরোধ করে নি।

সাধুকে এইভাবে গাঁয়ের সবাই মিলে শাস্তি দিয়ে আসছে, আজ এক বছর ধরে। দোষ সাধুরই বলতে হবে।

সেবক মাহাতোর মেয়ে রূপা। সকাল বেলা বিলে হাঁস ছাড়তে যায়, আর স্নান করে ফিরে আসে। সাধু চামার বিলের ধারে ঘুরঘুর করে; হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর একদিন কথাটা বলেই ফেললো সাধু রূপা আমার কথাটা কিছু ভাবছিস্ না?

এর পর আর তাকে মাপ করা যায় না। বয়েসে রূপার চেয়ে ছোট হয়েও এত সাহস পায় কোথা থেকে? সাধুকে একরকম একঘরে করেই রাখা হয়েছে।

সেবক মাহাতো সাধুকে অনেকবার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে—আমার মেয়ে তোমাকে বিয়ে করতে রাজী নয়। তুমি এসব নিয়ে আর আলোচনা করো না। বারবার জিদ করতে এস না।

রূপা দেখতে না হয় খুবই ভাল, কিন্তু সাধুর সঙ্গে বিয়ে দিতে দোষটা কি?

দোষ রূপার ইচ্ছেটা। আগে রূপা একরকম রাজীই ছিল। জিজ্ঞাসা করলে লজ্জা পেয়ে হাসতো, হাঁ-না কিছুই বলতে পারতো না। কিন্তু রূপা স্টেশনের হাসপাতালে কাজ পেয়েছে—মেয়েদের ওয়ার্ডের জমাদারণী। এই চাকরী জোটার সঙ্গে সঙ্গে রূপার সাজসজ্জা আর মনটা বোধ হয় চম্পুগাঁয়ের মেটে বাড়িগুলির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। গ্রামের মেয়ে হয়েও, গ্রাম-যমুনার ডাক যেন ভুলতে বসেছে রূপা।

গাঁয়ের অনেকে রূপার ওপর ও সেই সঙ্গে সেবক মাহাতোর ওপর খুব বেশি প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু মাহাতোর টাকার জোর আছে—পূজো-

পার্বণে সেবকের উদারতাই গাঁয়ের আনন্দোৎসবের একমাত্র আশ্রয়। আর সাধু যদিও কারিগর মাত্র, কিন্তু খেটে খায়—বয়স আছে শরীরও আছে। ও যদি রাজী হয়, তবে চম্পুগাঁয়ের যে কোনো মেয়ের বাপ খুশি হয়ে ওকে জামাই করতে রাজী আছে। কিন্তু সাধুর রোখ ওই একদিকে—রূপা।

মেয়েরা মনে মনে জ্বলে। গাঁয়ের বাতাসে রূপার নামে দু একটা বদনামের কথাও মাঝে মাঝে ফিস্ ফিস্ করে ওঠে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সেবক মাহাতোর প্রতিপত্তি কেউ ভুলতে পারে না।

গাঁয়ের অনেকে তাই সাধুর ওপরে চটা। ঠিক হয়েছে, এইভাবে শুধু হা-হুতাশ করে আর সেবক মাহাতোর কাছে অপমান খেয়ে ওর দিন কেটে যাক্।

রূপা নিজেকে গাঁয়ের অন্য মেয়েদের চেয়ে ভিন্ন রকম ভাবে এবং ভিন্ন করে রাখে। সকলের সঙ্গে এক হয়ে সরলভাবে মিশতে পারে না। মেয়েরা আজও একবার রূপাকে গাইতে ডাকলো; রূপা বললো—না, ওসব আমার ভাল লাগে না।

সভা ভাঙলে সবাই চলে যায়। তখন অন্ধকারে কাদাজলের ওপর দিয়ে ছপ্ ছপ্ করে একটি মানুষ সেবক মাহাতোর ঘরে এসে ওঠে। সাধুকে দেখে মাহাতোর নেশাড়ে মেজাজ জ্বলে ওঠে—এবার তুমি মার খাবে আমার হাতে।

সাধু তবু মিনতি করে বলে যায়; মাহাতো নিজের গর্জনে কিছু শুনতে পায় না। রূপা ঘরের ভেতর থেকে সব শোনে।

দশহরা উৎসব। শরতের নতুন আলোর সঙ্গে ক্ষেতের মাটিতে আর তৃণে শস্যে নতুন প্রাণের রঙ লাগে। গাঁয়ের সকলে শোভা-যাত্রা করে বার হয়। মেয়েরা যে-যার ভাল সাজটি পরে নেয়। আগে

আগে পুরুষেরা ঢোল বাজিয়ে চলে, পেছনে মেয়েরা একটানা অবিরাম গেয়ে চলে। সবচেয়ে আগে থাকে প্রকাণ্ড রঙীন পাগড়া মাথায় ও লাঠি হাতে সেবক মাহাতো, রূপাও থাকে শোভাযাত্রার সঙ্গে। ঠিক সঙ্গে নয়, সকলের পেছনে একটু সরে, একা একা। এক বাঙালী জমিদারবাবুর বাড়ি প্রতিমা দেখে, মেলা ঘুরে ওরা আবার ফিরে আসে গাঁয়ে। সেবক মাহাতোর ঘরে পান-ভোজন চলে।

সাধুকে কেউ ডাকে না। এক একটি পরব আসে, গাঁয়ের হৃদয়টার যেন কপাট খুলে যায়। সবাই সবাইকে ডাকে। সমস্ত দিনটার যেন লোকের মন থেকে রাগ হিংসার ধুলো ঝরে পড়ে যায়। সবাই সৌহার্দ্যের আনন্দে চঞ্চল। লোকের অহঙ্কারের বেড়াগুলি এই সময় একটু আলগা থাকে। সাধু ঠিক এই পরবের দিনগুলিতেই সাহস করে তার আবেদন নিয়ে আসে সেবক মাহাতোর কাছে। শুধু সেবক নয়, গাঁয়ের আরও দু-চারজন বয়স্কদের কাছে সে তার বেদনা ও বক্তব্য বুঝিয়ে বলে। কিন্তু কোনো ফল হয় না। সবাই বলে—এরকম দেওয়ানা হয়ে গেলে কেন ছোকরা? যেখানে আমল পাবে না, সেইখানে ভিড়বার এত জিদ্ কেন?

দশহরার রাতে সেবক মাহাতোর ঘরে সাধু আবার এল। সেবক অন্যদিনের মত আর তেমন বকাবকি করলো না। কিন্তু প্রত্যাখ্যানটা তেমনি সরল ও স্পষ্ট করে জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিল—দেখ সাধু, তুমি লোক ভাল জানি; কিন্তু পয়সাও তো একটা ইজ্জৎ। তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে সেইজন্য হতে পারে না। হ্যাঁ, যদি তোমার কিছু ক্ষেতজোত থাকতো, তবে না হয়…

সাধু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে চলে গেল। রূপা ঘরের কপাট একটু ফাঁক করে দেখছিল ও দুজনের কথাগুলি সবই শুনছিল।

দেওয়ালির উৎসবও এসে গেল। আবার ঘরদোর নিকিয়ে

তক্‌তকে করা হয়েছ। এ মাসেই রূপার পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে। আজ সে নিজে হাতে প্রদীপ সাজালো ঘরের চারদিকে। সন্ধ্যে হতেই উঠোনে একটা আগুনের কুণ্ড করে রাখলো—ভাঁড়ে করে জল রেখে দিল পাশে। মাঝরাত্রে প্রেতাত্মারা আসবে নিজের নিজের পুরানো ঘরে। জল খেয়ে তৃপ্ত হবে।

রাত্রি হতেই সেবক মাহাতোর ঘরের দাওয়ায় জুয়া আর মদের হুল্লোড় মেতে উঠলো। অনেক রাত্রি পর্যন্ত চললো উৎসব। সকলে চলে যাবার পর সেবক নিজেও ঘরের ভেতর চললো। উঠোনের দিকে তাকিয়েই ভয়ে চমকে উঠলো—কে?

যে-মূর্তিটা এগিয়ে এল সে আর কেউ নয়, স্বয়ং সাধু। সেবক যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চীৎকার করে উঠলো—টাঙিটা দেতো রূপা; আজ ওর সব সখ ঘুচিয়ে দেব।

রূপা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল; কিন্তু টাঙি হাতে নিয়ে নয়। একটা মোড়া নিয়ে এসে মাহাতোর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললো—নাও, বসে কথা বলো।

মাহাতো বসে নিয়ে শান্ত হলো। সাধুর সেই পুরানো কথা—একটানা বলে চলেছে। মাহাতো শুনে শুনে ঝিমিয়ে পড়েছে। রূপা আজ আর ঘরের ভেতরে যায় নি—একটু দূরে দাঁড়িয়েই সব শুনে গেল।

মাহাতো হঠাৎ সচকিত হয়ে বললো—আরে যা বাবা, বিরক্ত করিস না। তোর বয়স তো রূপার চেয়ে অনেক কম। আর একটু বড় হলে না হয়··· যা বিরক্ত করিস না।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রূপা বাইরে বার হতেই মাটির দিকে তাকিয়ে একবার থম্‌কে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে

কুটীল একটা হাসি তার দু ঠোঁটের ওপর দিয়ে যেন পাক দিয়ে গড়িয়ে গেল। রূপা দেখলো, ঘরের দোর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত কে যেন কতগুলি কালো সরষে ছিটিয়ে দিয়ে গেছে। রূপা আবার হাসলো। শেষে তুক করা সরষে সহায় হলো হতভাগার। কেঁদে হলো না, কাকুতি-মিনতিতে হলো না, জিদ-আব্দার-অনুরোধ সব ভেসে গেল, তখন আর উপায় কি? মন্ত্র ফুকে সরষে ছিটিয়েছে। আচ্ছা?

রূপা ডাক দিল—ও মাসী, এসে দেখে যাও।

থুড়থুড়ে এক বুড়ী একটা ঘরের ঝাঁপ খুলে বাইরে এল। রূপা দেখিয়ে দিল ব্যাপারটা—তুক্-করা সরষে কে ছিটিয়ে গেছে।

বুড়ী চীৎকার করে সেই সকালেই গাঁ মাৎ করে তুল্‌লো—সর্বনাশ করলে; কোন্ দুশমন পেছনে লেগেছে। এত ভাল বেটী আমার, এমন জোয়ান আর সুন্দর; তাই পেছনে লেগেছে গো। কি উপায় হবে গো।

পাড়ার অনেকে জুটে গেল। সেবক মাহাতো গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল। সবাই আলোচনা করলো—এমন দুষ্কর্ম কে করতে পারে? ব্যাপার খুবই গুরুতর মনে হচ্ছে। এর ভেতর অনেক রহস্য আছে।

সকলে দুশ্চিন্তায় মাথা দুলিয়ে এই সব কথা বলছিল। রূপা হঠাৎ বলে উঠলো—এত ভাবনায় কোনো কাজ নাই। আমি সরষে মাড়িয়ে যাব; দেখি, কোন্ পিশাচ আমার কি করতে পারে।

রূপা হনহন করে হেঁটে চলে গেল। সকলে সেবক মাহাতোর দিকে তাকিয়ে বললো—কাজটা ভাল হলো না মাহাতো।

সাধু দিন গুনছিল। রূপা সরষে মাড়িয়ে গেছে বেপরোয়া হয়ে—এ খবর শুনেছে সাধু। তার বিষণ্ণ মনের আকাশে এক

আহ্লাদের ঝড় নেচে চলে যায়। রাগ করে হোক আর লোভ করে হোক হরিণ একবার ফাঁদে পা দিলেই হলো। রূপা যেন এই প্রথম তার ভালবাসার রাঙামাটির পথ ধরে একবার হেটে গেছে উপেক্ষা-ভরে। কিন্তু তার পর?

সাধু শুধু দিন গুনে যায়। অনেকদিন ফুরিয়ে গেল, কিন্তু রূপার পায়ে সেই রাঙামাটির কোনো দাগ লাগে না। এদিকে সেবক মাহাতো এক নামকরা ওঝা আনিয়ে ফেলেছে। নানারকম ভয়ঙ্কর তুকতাক চলেছে সেবকের বাড়িতে। শোনা গেল, সেবক মাহাতোর শত্রুকে বাণমারার আয়োজন হচ্ছে। সাধু ভয়ে মুষড়ে পড়লো।

কিন্তু গাঁয়ের নানা জনে, নানা গোপন খবর এনে সেবক মাহতো আর ওঝাকে বিভ্রান্ত করে তুললো। তারা প্রায়ই দেখছে—সাধু রাত্রে ঘরে থাকে না। একদিন রাত্রে দেখা গেছে—জঙ্গলে বসে মড়ার খুলিতে পেঁচার চোখ পুড়িয়ে কাজল তৈরা করছে। অমাবস্যার রাত্রে একটা হাঁড়ি নিয়ে সাধু ফল্গুর মশান ঘাটে উলঙ্গ হয়ে জল তুলে নিয়ে এসেছে।

ওঝা একদিন সরে পড়লো—লড়াইটা একটু কঠিন হয়ে উঠেছে মাহাতো। অনেকগুলি দেও-দানার সঙ্গে লড়তে হবে। আমি একা পারছি না। আমার বড় সাকরেদকে নিয়ে আসি।

সেবক মাহাতোর সব আশঙ্কা দূর করে দিল আর একটা খবর—সাধু গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে; পল্টনে চাকরী পেয়েছে।

হাঁ এখন না গিয়ে তার উপায় কি? কত রকম উপদ্রবই না করলো। কিছুতেই কোনো কারসাজি আর সফল হলো না। ভালই হলো; এবার সেরঘাটের বনেদী কোনো রবিদাসের বাড়ির ছেলের সঙ্গে রূপার বিয়ে দিতে হবে, নিশ্চিন্ত হয়ে।

হোলি এসে গেল। এ এক অদ্ভুত পরব। শুক্লা বাসন্তীর এক সন্ধ্যায় বনান্তের কোলে পূর্ণচাঁদের রূপে দেখা দেবে শিশু নব বৎসর। পঞ্জিকা হাতড়ে একে খুঁজতে হয় না। আকাশের নক্ষত্র রাশিচক্র ক্রান্তি ও অয়নাংশে অঙ্ক কষে গুণে এই উৎসবের দিনক্ষণ মাপতে হয় না। অন্তরে ও বাহিরে এক অদৃশ্য পুষ্পধন্বার খেলা চলতে থাকে। আকাশের রঙে, বাতাসের স্পর্শে, আলোকের আভায়, গাছের কিশলয়ে মুকুলে হঠাৎ এক বিহ্বল যৌবন জেগে ওঠে। হোলি যেন মানুষের মন থেকে আগল খুলে বেরিয়ে আসে। এই একটি দিন মানুষ একটি সহজ সত্যকে উপলব্ধি করে, সে-সত্য হলো এই যে, মানুষের অন্য পরিচয় যাই থাক আসলে সে প্রাণ মাত্র। এই প্রাণ যখন সারা বছর ধরে সংগ্রাম করে যায়, তখন সে জীবন-সৈনিক বা সামাজিক মানুষ মাত্র। তারপর একটি দিনের জন্য বসন্তের একটি পূর্ণিমায় সে ছুটি পায়। সৈনিকের পোশাক ছেড়ে ফেলে আবার রঙীন উত্তরীয় তুলে নেয়। এই কুঙ্কুমের বর্ষা, আবীরের ঝড়, রংঝারি আর পিচকারি ফোয়ারা—নিখিল চিত্তের স্নায়ুজাল থেকে শেষ ভীরুতার চিহ্নটুকুও মুছে ফেলে রঙীন করে তোলে। হৃদয় আসি যেথা করিছে কোলাকুলি—দোল-পূর্ণিমায় মানুষের মেলায় তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়।

চম্পূগাঁয়ের সেবক মাহাতোর আঙিনায় ঢোলক ও বাঁশীর শব্দে হোলির রাত্রি প্রমত্ত হয়ে উঠলো। সারা বছরে তৃষ্ণা মিটিয়ে পুরুষেরা সকলেই যেন তাড়িতে মদেতে দেহমন চুবিয়ে নিয়েছে। মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই এই দশা।

মেয়েরা আসর থেকে একটু দূরে বসেছিল। পুরুষেরা ছেলে বুড়ো সবাই নেচে গেয়ে ছড়া কাটছে। খিস্তির উদ্দাম হুল্লোড় থেকে থেকে ঢেউ-ভাঙা জলরোলের মত ছড়িয়ে পড়েছে। নরনারীর সবারই

গায়ের বসন রঙের ছোপে বিচিত্র। রূপা শুধু এড়িয়ে গেছে—মেয়েরা অনেক অনুযোগ সাধ্যসাধনা করেছে। কিন্তু আবীরের একটি ছোট টিপ ছাড়া আর কোনো রঙ সে নেয় নি। এই উৎসবে সে যেন একজন দর্শকের মত শুধু বসে আছে।

টলতে টলতে একজন এসে আসরে ঢুকলো—সাধু চামার—হাতে একটা বাঁশী। সঙ্গে সঙ্গে সেবক মাহাতো সাধুর তিন পুরুষ তুলে একটা খেউর গেয়ে উঠলো। সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে সমর্থন জানালো—সা-রা রা-রা সা-রা রা-রা। ঢোলক বাজিয়ে সেবক মাহাতো গাইলো—

রাত অনেক বাত অনেক, নাই পাহারা।
ভুখ লাগা? এস এস কুত্তা হামারা॥

সকলে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঢোলকে চাঁটি দিয়ে নেচে লাফিয়ে সমস্বরে সায় দিল—সারা রারা। মেয়েরা হেসে লুটোপুটি করতে লাগলো।

সাধু চামার বাঁশীতে একবার ফুঁ দিয়ে একটা হাত তুলে নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়ালো। এবার তার পালা। সাধু জবাব দিল,—

চুপ রহ, চুপ রহ, বোকা চম্পুগাঁও।
বেতাল দেবের বড় চেলা পূজো মেরা পাও॥

সকলে এক সঙ্গে গর্জন করে জবাব দিল—আরে, যাও যাও!

আজ কি আর কেউ এ-কথায় ভয় পায়। ভূত প্রেত বেতাল বরমদেব—আজ সব তুচ্ছ। সাধু চামার ভয় দেখাতে এসেছে—সে বেতালসিদ্ধ হয়েছে। এ-সব ফাঁকি ফন্দী ভূতচতুর্দশীর রাত্রেই মানায়।

সাধু চামার বাঁশী বাজিয়ে এক পাক নেচে নিয়ে আবার গাইলো—

খুস্ থাক দুশমন, অনেক দিলে সাজা।
সেপাই হয়ে ফিরে এসে দেখ লেগা মজা॥

সকলে—আরে যাঃ যাঃ।

সকলে যেন ধিক্কার দিয়ে উঠলো, পল্টনে নাকি চাকরী পেয়েছে সাধু। যাক্ না চলে! আজকের দিনে আবার শাসাতে এসেছে সকলকে—মজা দেখে নেবে। আজ কে কার পরোয়া করে?

সাধু আর একবার নেচে নিয়ে ধরলো,—

তোপ ফাটা, বোম মারা, দম নাহি পায়।
লড়ে ফিরে সাধুরামের প্রাণ চলে যায়॥

সকলে—আরে, হায় হায়!

ঢোলকের বাজনা একটা মৃদুতর হয়। মেয়েদের মধ্যেও চাঞ্চল্য কলরব একটু স্থির হয়ে আসে।

সাধু গেয়ে যায়—

শুক বলে সুখ নাই, নাই ঠিকানা।
তবু সারীর কালো চোখে জল ভরে না॥

সকলে উত্তর দিল—আরে, না না!

আরে না, না। এক ললিত আশ্বাসের সুর। আরে না না অভিমান করো না, চলে যেও না। জ্যোৎস্নালোকে তোমার সারীর কালো চোখ চক্‌চক্ করছে, দেখতে পাচ্ছ না? সেবক মাহাতো আস্তে আস্তে একটা খঞ্জনী বাজাচ্ছে। সকলে ঢোলক বাজিয়ে দুলে দুলে নাচছে—আরে না, না। ক্লান্ত সাধু বিভোর হয়ে বাঁশী বাজিয়ে চললো। হঠাৎ বুড়ো সেবক মাহাতো যেন একটা খুশির দমকা লেগে চেঁচিয়ে উঠলো—সারা, রারা, হোলি হ্যায়।

মেয়েদের মধ্যে এই আনন্দ চাঞ্চল্যের ঝাপটা গিয়ে লাগলো। সব মেয়েরা মিলে হাসতে হাসতে মুঠো মুঠো আবীর নিয়ে রূপাকে চেপে ধরলো—এইবার তোকে রঙ মাখতেই হবে।

গল্পলোক । রিতা

রি তা

জল নেবার জন্য রিতা ছোট পাহাড়ী নদীটার বালির ওপর এসে দাঁড়ালো।

মাঝ নদীতে বালির ওপর দিয়ে সরু একটা জলস্রোত, ঘড়া ডোবে না। অনেকক্ষণ হাত দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে একটা গর্ত করলো রিতা। তারপর সেখানে ঘড়া ডুবিয়ে দিয়ে নিজে একটু দূরে নীচের স্রোতের ধারে বসে হাত পা ধুয়ে নিল। মুখটা ভাল করে মেজে নিয়ে আঁচল দিয়ে মুছে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো, দূর মহুয়ার ভিড় অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একফালি চাঁদ উঠেছে মাথার ওপর। ভরা সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠেছে।

কলসীটা কাঁখে তুলতে আর ইচ্ছে করলো না। কানাটায় হাত দিয়ে হেঁচড়ে কিছু দূর নিয়ে গিয়ে একটা কালো পাথরের চটানে এসে দাঁড়ালো। আজ তার আর কিছু ভালো লাগছে না।

অনেকদিন থেকেই তার ভাল লাগছিল না। সাঁওতাল চাষার মেয়ে রিতা। পাহাড়ের ঢালুতে ছোট একটা ডিহি। এ ডিহিতে যে সাঁওতালদের বসতি তারা তাদের জংলীপনা হারিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু চাষ আবাদেও হাত পাকে নি। আইন কানুনকে ভয় খায় বেশি। জংলীদের মত বেপরোয়া মহুয়ার মদ চোলাই করতে পারে না। ট্যাক্স দেয় বেশি, কাপড় চোপড়ের প্রয়োজন বেড়েছে, অথচ আয় নেই। বার মাসে একটা ফসল তাদের ক্ষিধে মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তাই মাঝে মাঝে কুলি রিক্রুটারের ক্যাম্প বসে। টাণ্ডেলেরা ডিহি বস্তি ঘুরে ঘুরে জোয়ান খাটিয়ে লোক যোগাড় করে আনে। কিছু

আগাম পায়, খাকি কোট আর পাগড়ী পায় বিনা পয়সায়। তিন বছরের কণ্ট্রাক্টে ফিজি দ্বীপে চালান হয়।

রিতা শুধু শুনেছে তার বিয়ে হয়েছে। চাষী সাঁওতালেরা প্রায় হিন্দু হয়ে গেছে। অল্প বয়সেই ছেলে মেয়ের বিয়ে দেয়। লগন মাঝির মেয়ে রিতার বিয়ে হয় মাত্র সাত বছর বয়সে।

তারপর থেকেই রিতা আজ দশ বছর ধরে শুনে আসছে মুনার কথা। বিয়ের কয়েক মাস পরে সেও তিন বছরের কণ্ট্রাক্টে ফিজি চলে গেছে। রিতার শ্বশুরবাড়ির ভিটের ওপর এখন একটা ধুতুরার জঙ্গল। সে বাপ মায়ের কাছেই থেকেছে আর বড় হয়েছে। দিনের পর দিন শুনে আসছে, মুনা এবার ঘরে ফিরবে। চিঠি এসেছে।

সত্যিই মুনার চিঠি আসে। সে খুব ভাল আছে। কাজের অনেক উন্নতি হয়েছে। পয়সা জমেছে কিছু। সে লেখাপড়াও কিছু কিছু নাকি শিখেছে। সাহেবরা তাকে ভালবাসে। সাহেবরা কত বকশিশ দেয়, দামী দামী পোশাক বাঁশী টুপি···

চিঠিতে প্রবাসী পতির এইসব কুশলসংবাদ দিনের পর দিন শুনে আসছে রিতা। লগন মাঝি সমস্ত ডিহি ঘুরে সগর্বে এইসব বার্তা আরও বেশী করে রটিয়ে বেড়ায়। রিতার সৌভাগ্যের কথা সকলে আলোচনা করে।

কৌতূহলের পালা শেষ হয়ে গেছে অনেক দিন। ওসব সংবাদে রিতার আর মন ভরে না। এতদিনে তার আসা উচিত ছিল।

পাথরের চটানে দাঁড়িয়ে রিতার মনে এই চিন্তাই মন্থর কুয়াসার মত ভর করেছিল। আর কতদিন এই ভাবে, এই মনে মনে দেখার একটানা অভিনয় চলবে?

রিতা আবার চলতে শুরু করলো। উঁচু নীচু মেঠো জমি পার

হয়ে ডিহির কাছাকাছি পৌঁছেছে। কাঠগোলাপের বনে হালকা ঝড়ের দোলা লেগেছে। কাকের ঝাঁক এসে কলরব করে দেওদারের মাথায় এসে আড্ডা নিচ্ছে। রিতা রাগ করে একটা হোঁচট খেল।

আর একটু দূর এগুতেই দেখা গেল, পথের মাঝে দাঁড়িয়ে হুটু। একথা রিতার জানাই ছিল। শুধু আজ নয়—আজ তিন বছর ধরে হুটু তার পেছনে ঘুর ঘুর করছে।

হুটু বাঁশী বাজিয়ে রিতার নামে গান গায়। উত্তরে রিতা ওকে গালাগালি দেয়। হুটু খরগোস শিকার করে এনে লগন মাঝির বাড়িতে দিয়ে যায়। ঘরসুদ্ধ লোক মাংস খায়, রিতা ছোঁয় না। হুটু যতবার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে, রিতা তাকে বিমুখ করছে।

হুটুর উপদ্রবে রিতার রাগ পড়তো গিয়ে ফিজি প্রবাসী মুনার ওপর। হুটুর এই দুঃসাহস কি করে সম্ভব হয়? হয় ও জানে মুনা আর আসবে না, নয় মনে করে রিতা বুঝি মুনাকে ভালবাসে না।

মুনাকে ভালবাসে রিতা। কিন্তু মুনাকে তার প্রথম যৌবনের চোখে সে আজও দেখতে পায় নি। মুনা তার কাছে কল্পনা মাত্র। কিন্তু সে কল্পনার মধ্যে রামধনুর মত কত না বিচিত্র মোহ মিশিয়ে আছে। সমস্ত ডিহি যার নামে স্তুতিমুখর, সেই মুনা তার স্বামী। মুনা জোয়ান মরদ, মুনা রোজগার করে, পয়সা জমিয়েছে। যখন দেশে ফিরবে মুনা, সমস্ত ডিহির দাম যেন বেড়ে যাবে। ভাগ্যিস অনেকদিন আগেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, নইলে বড় মাঝির মেয়েই হয়তো মুনার ঘরণী হয়ে যেত! রিতার চেয়ে সে অনেক সুন্দর।

হুটুকে ডিহির লোকে দেখতে পারে না, গরীব বলে নয়, বেজায় কুঁড়ে আর বখা। রিতার ওপর ওর অনুরাগের কথা ডিহির অনেকে টের পেয়েছে। ওকে কড়া কথায় অনেকে শাসিয়েও দিয়েছে—সামলে চল। নিজে ভাল হতে শেখ তবে রিতার মত কত ভাল মেয়ে তোকে

বিয়ে করতে চাইবে। তা ছাড়া পরের বউ, অত মাখামাখি ভাল দেখায় না। মুনা মাঝিও শীগগির আসছে। শেষকালে কি ডিহির মধ্যে একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটাবি।

দূর ফিজির বাগানেও চাঁদ ওঠে। মুনা দেশের কথা ভাবে নিশ্চয়। কিন্তু বেশি করে ভাবে রিতার কথা। চিঠিতে খবর পেয়েছে—রিতা ডাগর হয়েছে, তার ওপর নাকি রাগ-অভিমান করে আর মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে।

সমস্ত বছরে তিনটে বা চারটে চিঠি পায়। তার মধ্যে শেষ চিঠিগুলিই মুনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। রিতা নাকি খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। তবে বাপ-মার সঙ্গে প্রায়ই কোঁদল করে—মুনা কেন দেশে ফিরছে না।

রিতাকে মনে পড়ে। কিন্তু আট বছর আগে বিয়ের দিনে দেখা রিতার সে-মুখটি আর মনে পড়ে না। হলুদ ছোপানো কাপড় পরে কাকার কোলে চড়ে বিয়ের আসরে এল রিতা। তারপর পূজোপাট হয়েছে, মাদল বেজেছে, ঝুমুর হয়েছে, আর অন্য কিছু মনে পড়ে না।

রিতাকে এইভাবে শুধু চিঠির মধ্যেই পেয়ে এসেছে মুনা—আর ছুটির পর বাগান থেকে ঘরে ফিরতে একা পথে কল্পনায় অনেক কিছু পেয়েছে।

মুনা তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা পরিকল্পনা করে রেখেছে। তাই সে শুধু মুখ বুজে কঠোর পরিশ্রম করে। কিছু পয়সা জমানো চাই। সেই সঙ্গে লেখাপড়া শিখে নিতে হবে। তার পর দেশে ফিরে নিজের সঙ্গিনীকে আবার কাছে টেনে নেবে।

কিন্তু ডিহিতে থাকা আর চলবে না। শহরে ছোট একটা ভাড়া ঘরে সে নতুন সংসার পাতবে। বিনা মাইনেতে এপ্রেন্টিস খেটে

বয়লার মিস্ত্রির কাজটা সে ভাল করে শিখেছে। আর জীবনে বাগানের কুলিগিরি নয়।

একটা সিঙ্গল রীডের হারমোনিয়ম কিনেছে মুনা। মাদ্রাজী গান, হিন্দী গান গাইতে শিখেছে। সাহেবদের দেওয়া ট্রাউজার পরে নাইট ক্যাপ মাথায় দিয়ে মাঝে মাঝে পোর্টেতে সিনেমা দেখে আসে।

মুনার কুলিদের টাণ্ডেল অনেক সময় ঠাট্টা করে বলেছে—কুলি হয়ে এসব কাপ্তেনী ভাল নয় রে ছোঁড়া। দেশে ফিরলে বউ আর চিনতেও পারবে না। ঘরেও নেবে না।

মুনা জানতো দেশে ফিরে আর থাকছে কে? রিতাকেও তারই মতন কায়দাছুরস্ত করে নেবে। তাকে কুলির বউ করে রাখবে না সে। পাহাড়িয়া চাষীজীবনে ফিরে যাবার মত মতিগতি তার আর নেই। কিন্তু এবার বোধ হয় ফেরা উচিত। বেচারী রিতা!

মুনার মনে তার কল্পনার রিতা সমস্ত রূপ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ডিহির পঞ্চায়েতের বৈঠকে হুটুর সাজার নির্দেশ হয়েছে। দশ টাকা জরিমানা। যেমন করেই হোক, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে পাথর ভেঙে ওকে দশ টাকা রোজগার করতে হবে আর জরিমানা দিতে হবে। নইলে এ ডিহিতে ওর স্থান নেই।

হুটু বললো—আমি রিতার কাছে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। ও ক্ষমা করে দিক। জরিমানা যেন না করা হয়। গাঁয়ের বাইরে তাড়িয়ে দিলে আমি মরে যাব।

কিন্তু অপরাধ বড় কঠিন। সহজে মুক্তি দেওয়া যায় না! নোংরা চেহারা, কাজে কুঁড়ে, হুটুর জংলী স্বভাব আজও গেল না। উপোসেও ওর পাথুরে শরীর যেন কাবু হয় না। দিন গেলে ছুটো কাঠবিড়ালী মেরে পুড়িয়ে খেয়ে নিলেই ওর চলে গেল। চুলের ঝুঁটিতে সর্বদা

বাঁশী গুঁজে রাখে। সকলে যখন মাঠে খাটতে বের হয় হুটু তখন একটা আলের ওপর শুয়ে বাঁশী বাজায়।

এ-সব অপরাধ ক্ষমার্হ। কিন্তু পরের বিয়ে-করা বউয়ের পেছনে একটা উপদ্রবের মত লেগে থাকা, কোনো পঞ্চায়েত ক্ষমা করতে পারে না।

রিতা সেদিন স্রোতে স্নান করতে গিয়েছিল। বনের নিরালায় নিশ্চিন্ত মনে সে স্নান করছে, একটা কুলের ঝোপ থেকে এক ঝাঁক তিতির উড়ে পালিয়ে গেল, যেন ভয় পেয়ে। রিতার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তখুনি ধরে ফেললো অপরাধীকে। ঝোপের ভেতর হুটুর ঝাঁকড়া চুলের মাথা দেখা যাচ্ছে।

ঘরে ফিরে এসেই রিতা লগন মাঝিকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছে।

এই অপরাধেই হুটুর শাস্তি। হুটু হাত জোড় করে পঞ্চায়েতের কাছে নিবেদন করলো—আমি রিতাকে বহিন বলে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। ও ক্ষমা করে দিক।

রিতা বললো—না।

হুটু ডিহি ছেড়ে চলে গেছে। রিতা তার ঔদ্ধত্যকে মাপ করতে পারে নি, এর জন্য রিতার মনেও কোনো আপসোস নেই। হুটুর এই অপরাধ, এই আবদার, অনেকটা বামন হয়ে চাঁদ ধরার সখের মত। তার স্বামী মুনার কথাও তো হুটু সবই শুনেছে। তবে কেন সে প্রতিযোগিতায় নামে, কোন্ সাহসে?

চিঠিও এসে গেল, মুনা আসছে। আগামী সপ্তাহে ওদের জাহাজ ছাড়বে।

রিতার বুক দুরদুর করে উঠলো। এ-কী অদ্ভুত চাঞ্চল্য। মুনা

আসছে। ফিজি দ্বীপের চাঁদ নীল আসমানে ভেসে এসে এই মহুয়ার মাথায় এসে দাঁড়াবে।

জঙ্গল থেকে কোচঁড় ভরে রিঠা ফল কুড়িয়ে এনে ঘরে রাখলো রিতা। মোটা মুঙ্গার মালা একটা ধুয়ে রাখলো।

খিদিরপুর থেকে চিঠি এসে গেছে। জাহাজ পৌঁছে গেছে। মুনা তিন দিন পরে পৌঁছচ্ছে দেশে!

ডিহির সব মাঝিরা রাত থাকতে স্টেশনে এসে বসে রইল। ভোরে কলকাতার ট্রেন থামে। লগন মাঝি একটা পাল্কী খুঁজছিল, কিন্তু ভাড়া বেশি বলে আর যোগাড় হলো না।

ট্রেন থেকে একদল কুলি নামলো। নানা গাঁ ও ডিহি থেকে কুলিদের মা বউ ও ছেলে-মেয়েরা এসেছে। বুড়ীরা তাদের ছেলেদের কাঁধে মুখ রেখে একচোট কেঁদে নিল। যাদের ছেলেরা আসে নি তারাও কাঁদলো। সোরগোল শেষ হবার পর নানা দিকের পথে মাঠে জঙ্গলে যে যার ঘরে চললো।

আর নামলো মুনা। কালো ফুল প্যাণ্ট পরা, গায়ে কোট আর কম্ফোটার জড়ানো। পায়ে জুতো আর মোজা। বিবর্ণ একটা পুরানো ফেল্টের টুপি মাথায়। মোটা বর্মা চুরুট হাতে।

মাঝিরা হাঁ করে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলো। মুনা লগন মাঝির কাছে এগিয়ে এসে হাঁটুতে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সকলের জড়তা যেন একটু ভাঙলো। বুড়ো মাঝিদের দু'একজন মুখ ফুটে সাহস করে কুশল প্রশ্ন করলো।

তারপর ডিহির পথ। মুনা আগে আগে চলেছে। মাঝিরা সকলে পেছনে দল বেঁধে চলেছে। সাড়া শব্দ বড় কিছু নেই। মুনা এক একবার থেমে তাদের সঙ্গ নিলেও তারা যেন থেকে থেকে পিছিয়ে পড়ছে।

কথা ছিল মুনা ডিহিতে ঢোকা মাত্র ছেলেরা মাদল বাজাবে। তারপর তো সমস্ত দিনের উৎসব লাগবে। লগন মাঝি একটা পাঁটা কিনে রেখেছে।

রিতা তার মায়ের নির্দেশ মত সাজ করেছে। ভয়ে বুক কেঁপেছে, লজ্জা করেছে, তবুও। নিজেকে জোর করে শান্ত করে আনে রিতা। বেশী লজ্জা করে প্রথম দেখার সব আনন্দটুকু যেন নষ্ট না হয়। সে হয়তো রাগ করবে।

বটতলার নীচে লোকজনের গলার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। কিন্তু ছেঁলেদের মাদল বাজলো না। রিতা কৌতূহলী হয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

লগন মাঝি আর সঙ্গে আরও দু'তিনজন মাঝি ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে অদ্ভুত ইংরাজী পোশাকে একজন লোক। রিতা অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। এরা মুনার খবর নিয়ে আসছে। মুনা হয়তো তুলসী মাঝির গোলায় বিশ্রাম করছে।

লগন মাঝিরা রিতার সামনে এসে দাঁড়ালো। রিতা বোকার মত তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে একজন মাঝি চোখ টিপে ইসারায় জানালো—ঘরের ভেতর যা।

রিতা তবু দাঁড়িয়েছিল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে নি। লগন মাঝি আবার মুখের ইসারায় জানিয়ে দিল—মুনা।

এক দৌড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে রিতা থরথর কাঁপতে লাগলো। ওর মা এসে ধরে দু'বার ঝাঁকুনি দিল—ও কি হচ্ছে ?

সমস্ত ডিহিটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। মুনা ফিরেছে, ডিহির ছেলে মুনা। কিন্তু আমোদ তো জমলো না। ছোট ছেলেরা দেয়ালে

মাদল ঝুলিয়ে রাখলো। পাহাড়ের ওপারে গির্জার একটা দেশী সাহেব আজ তাদের ডিহিতে ঢুকেছে, ভয় দেখাবার জন্য।

আটহাতি খেরো কাপড়ে রিঠে মাজা শরীর জড়ানো, শালবনের জংলী চাষীর মেয়ে রিতা। চোখে জল দেখা দেবার আগেই মাকে বললো—ছেড়ে দাও আমি ঠিক আছি।

তবু চোখের জলের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আর একটা কল্পনার ছবি চকচক করে উঠলো—ডিহি ছাড়িয়ে বহু দূরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের পাশে রোদের মধ্যে বসে জংলী হুটু একা পাথর ভাঙছে। ওর পাশে ঝুড়ি হাতে সে যদি গিয়ে একবার দাঁড়াতো, খারাপ কিছু বোধ হয় হতো না।

গল্পলোক । তমসাবৃতা

তমসাবৃতা

ধুলগড়া হলো বাউরী চাষী আর বোষ্টম তাঁতীদের একটা গাঁ। তাঁতীরা তাঁত ছেড়েছে দুপুরুষ আগে। এখন তারাও সবাই চাষী, কিন্তু বাউরীদের মত এত খাটিয়ে পিটিয়ে পাকা চাষা তারা নয়। তাঁতীদের কাছে বাউরীরা হলো সত্যিকারের চাষা চোয়াড়। রঙীন গামছা কাঁধে ঝুলিয়ে যতদূর সম্ভব তারা নিজেদের আভিজাত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে।

বাউরীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছেলেটির নাম ছিল দয়ারাম। সে মারা গেছে আজ ক'বছর হলো, সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটিকে বিধবা করে —যার নাম জবা! জবার বাপ কুঞ্জ বাউরী মেয়ের আবার বিয়ে দিতে চায়। জবাও জানে আজ হোক কাল হোক তাকে বিয়ে করতেই হবে। গাঁয়ের সবার ইচ্ছে, এ গাঁয়েরই কারও সঙ্গে জবার বিয়ে হোক। জবার বাপও তাই বলে।

কিন্তু জবাকে ঘরণী করার মতো যোগ্যতা এ-গাঁয়ের কোন্ ছেলের আছে? দয়ারামের সঙ্গে রূপগুণের তুলনা করলে তাদের নিতান্তই দীনহীন মনে হয়। এক এক করে প্রায় সব কটি বিয়ের যুগ্যি ছেলের কথা মনে পড়ে। জয়, মতি, মধু, গুণধর···। বয়সের দিক দিয়ে এদের মধ্যে যে কোনো একজনের সঙ্গে জবাকে মানাবে ভালই। চেহারার দিক দিয়েও এরা কিছু কম নয়—সুগঠন ও সুশ্রী চেহারা। তবু সকলেরই অভিমত দয়ারাম নাকি সবচেয়ে সুন্দর ছিল।

দয়ারাম ছিল সৌখীন ও সুবেশ। তার গামছা পরিষ্কার, ধুতি ফর্সা, চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। সেই দয়ারাম আজ নেই।

তার শুভ্র সুন্দর স্মৃতিটুকু এখনো রাজহাঁসের মত ডানা মেলে গাঁয়ের আকাশে উড়ে বেড়ায়।

দয়ারামের কথা উঠলেই তার চেহারাটা আজও সকলের চোখে ভেসে ওঠে। ঘরেই থাক বা বাইরে থাক—ক্ষেতে কাজ করার সময় পর্যন্ত দয়ারামের পরিধানে থাকতো সাদা ধোলাই ধুতি। অনেক দূর থেকে দেখলে মনে হতো ক্ষেতের মাঝখানে কাদাজলের মধ্যে একটা বড় শালুক ফুটে আছে।

কাজের সময় সবাই পরতো ছেঁড়া গামছা বা পুরানো কাপড়ের একটা টুকরো। বুড়ো গোছের চাষীরা কোমরে নিছক একটা কাপড়ের ফালি ঝুলিয়ে কাজে নামতো। তাদের চেহারাগুলিও কেমন মেটে মেটে হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখলে চেনা যেত না, মেঠো তিতিরের মত তারা যেন গায়ের রঙ ফাঁকিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে আছে।

বিধবা হবার পরও জবা বাপের সঙ্গে ক্ষেতে খাটতে গিয়েছিল কয়েকবার; মাঝে মাঝে আলের পাশের ক্ষেতে তার দৃষ্টি ছুটে যেত—নিড়েনে বসে আছে মতি। সামান্য একটা লেংটি কোমরে, চওড়া কালো পিঠটা রোদে পুড়ে চকচক করছে। জবা বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। হলোই বা পুরুষ মানুষ, গরু ঘোড়ার মত ওদের এরকম নির্বসন হয়ে থাকাটা জবার কাছে বড় বিদ্‌ঘুটে মনে হয়।

ঘাট থেকে জল নিয়ে ফিরতে জবা দেখতো—পথের পাশে গাছ কাটছে গুণধর। এমন একটা ছেঁড়া গামছা পরে আছে যে, সেটা না থাকলেও কোনো ক্ষতি হতো না। জবা হেঁট মুখে চলে যায়। গুণধর একবার টাঙ্গিটা নামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জবার দিকে তাকায়—স্বেদাক্ত শরীরটা শিশির-ভেজা আবলুসের মত থরথর করে।

জবার বিয়ে দেওয়া উচিত। প্রস্তাবটা এই পর্যন্ত এসে থেমে থাকে আর অগ্রসর হয় না। পাত্র হিসাবে কারও নাম করতে সহসা

কেউ সাহস করে না। কে না জানে দয়ারামকে জবা কত ভালবাসতো? সেই জবার কপালে সিঁদুর যে দেবে, তাকে অন্তত দয়ারামের কাছাকাছি রূপগুণ পেতে হবে। একটু সৌখীন সুবেশ কোনো জোয়ান হলেই ভাল। কিন্তু সে-রকম পাত্র কই?

এ বছরের মত ফলান ধূলগড়ায় সাত বছরের মধ্যে হয় নি। ক্ষেত-ভরে ফসল ফলেছে; রাত জেগে গানে গানে খড়িয়ান সেরেছে তারা। নতুন খড়ে গরুগুলির হাড়ে মাংস লেগেছে। সারি সারি ধান বোঝাই গাড়ি—ধূলগড়ার সম্পদ গঞ্জে বেচে এসেছে দু'গুণ দরে। কিন্তু মাত্র তিনটি মাসের মধ্যে ধূলগড়ার স্বাচ্ছন্দ্যের উল্লাস ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়তে লাগলো। বিয়ে পরব উৎসবের কল্পনা দূরে সরে গেল বেলাশেষের ছায়ার মত। দু'মাসের মধ্যেই তারা বুঝেছে, দোষ কারও নয়। তারা নিজেই নিজের পেটে পাগলা শুয়োরের মত দাঁত বসিয়েছে। ধূলগড়ার গাড়িবোঝাই সোনা ফেলে দিয়ে এসেছে গঞ্জের চাল-কলের কালিমাখা পায়ের কাছে। ছোঁড়া গামছায় বাঁধা যত কোমরের ট্যাকে কাগজের টাকা কুঁকড়ে পড়ে আছে—অসার অর্থহীন আবর্জনা।

খেতে হবে সারা বছর, টাকায় সাড়ে চার সের চাল। আবার গঞ্জের গোলায় কাঙ্গালের মত ঘুরে ফেরা। ঘামে ভেজা নোংরা নোটগুলিকে মুঠো করে ধরে তারা মর্মে মর্মে বোঝে, এর চেয়ে ধূলগড়ার একমুঠো মাঠের কাদার দাম বেশি।

শুধু ধূলগড়া নয়, চারদিকের আরও বিশটা গাঁ একই ভুল করেছে। ওরা দর চেয়েছিল,—পেয়েছে দর। ভাল করেই পেয়েছে, চার টাকা দু'আনা মন ধান। সুতরাং কারও বিরুদ্ধে তাদের কিছু বলবার নেই। ওরা নিজেই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিয়েছে।

তিনটি মাস না ফুরোতেই সারা গাঁয়ের প্রাণ এক অভাবের আতঙ্কে খাবি খেতে লাগলো। আবার সাতটি মাস আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা।

তাঁতী চাষীদের অবস্থাও তাই। তাদের কাঁধের রঙীন গামছা একে একে খসে পড়েছে। বড় আশা ছিল খুঁটিতে ঝোলানো সাধের মৃদঙ্গ-গুলি আবার বেজে উঠবে। বুড়োদের মধ্যে কেউ কেউ ভেবেছিল — স্থপুরুষের কবর দেওয়া তাঁতের হাড়গোড়গুলিকে হয়তো আবার টেনে তুলে জিয়োন যেতে পারে। সামান্য কিছু টাকার পুঁজি—তারপর ঘটা করে একটি ব্রত—ঘট সিঁদুর পাঁচালি গান। আজও তাদের এই জরাজীর্ণ শিল্পীসত্তা আবার সাড়া দিয়ে উঠতে পারে। ঘরে ঘরে নাটাই ঘুরবে, মাকু নাচবে—বেশে বাসে বৈভবে ধুলগড়ার যৌবন হয়তো আবার সেজে উঠবে। সে স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। তাঁতীরা বুঝেছে—ভুল হয়েছে তাদের।

অসহায় ধুলগড়া যেন তার অনুশোচনার ভারে নিঝুম হয়ে গেল। এরই মধ্যে হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠলো—এর প্রথম সাড়া এসেছে তাঁতী পাড়ায়। দীনবন্ধু তাঁতীর ছেলে মোহনবাঁশি অনেকদিন গাঁছাড়া হয়েছিল, শোনা যেত সে নাকি সদরে কি সব ফেরি কারবার করে। আজ সে ফিরে এসেছে আবার নিজের গাঁয়ে।

ধুলগড়ার সব পাড়া একবারে ঘুরে গেল মোহন। গায়ে নতুন নীল উর্দি, বাবরি-করা তেলা চুলের উপর আলগোছা নীল মুরেঠা বসানো। কোমরে চামড়ার পেটি, তার ওপর পেতলের তকমা। মোহন চৌকীদার হয়েছে—চারটে গাঁ নিয়ে ওর চৌকী, সাত টাকা মাইনে। টাঙ্গিটা আলগাভাবে কাঁধে ঝুলিয়ে মুখভরা হাসি নিয়ে মোহন সব পাড়া ঘুরে গেল।

যে পাড়া দিয়ে যায় মোহন, পেছনে ন্যাংটো ছোট ছেলেদের দল

ধাওয়া করে চলে। দাওয়া থেকে গামছা-পরা প্রৌঢ় প্রবীণেরা প্রথম বিস্ময়ের অভিভাব কাটিয়ে কুশল প্রশ্ন করে। বড় বড় মেয়েরা একবার আড়চোখে দেখে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তাদের ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁকে ফাঁকে মোহনের দৃষ্টিটা গায়ে এসে বিঁধে। বহুড়িরা বৃথা ঘোমটা টানার চেষ্টায় একবার ঘাড়ের দিকটা হাতড়ায়। খাটো কাপড়ে ঘোমটা কুলোয় না।

বাউরী পাড়ার বাথানের কাছে গোবর নেবার জন্য ছোট বড় অনেকগুলি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর ছিল জবা। আঁকাবাঁকা অনেক পথ মাড়িয়ে মোহন সেখানে এসে থামলো। মনে হলো এতক্ষণ এই উদ্‌ভ্রান্তির পর সে যেন একটা অভীষ্ট লাভ করে ক্ষান্ত হলো।

মেয়েরা বাথান থেকে গোবর কুড়িয়ে নিয়ে তালপাতার ওপর জড়ো করে রাখছিল। এক জবা ছাড়া আর সবারই চেহারা ঐ পচা গোবরের মতই বীভৎস দেখাচ্ছিল। কারও কোমরে একটা কাঁথা জড়ানো, কেউ একটা চট একপাক জড়িয়ে নিয়েছে। কেউ পরে আছে একটা বহু প্রাচীন রঙীন শাড়ির ধ্বংসাবশেষ। দেখতে কুরূপ বোধ হয় কেউ নয়। পরিধেয় এই কদর্য বস্তুগুলিই তাদের চেহারা কদর্য করেছে। এর চেয়ে নিশ্চয় ওরা অনেক সুন্দর।

জবার কথা আলাদা। তার গায়ের শাড়িটা খাটো হলেও আস্ত। তবে বহু ব্যবহারে স্থানে স্থানে ফেঁসে গেছে। দেখে মনে হয় জবা এখনো যেন কোনো মতে তার যৌবনের প্রথম সঙ্গী, সুশ্রী সুবেশ দয়ারামকে শ্রদ্ধার শেষ সঞ্চয়টুকু দিয়ে বুকে ধরে রেখেছে।

চৌকীদার মোহনকে চিনেছে সবাই। তবে আর কেন? এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ কি? হয়তো আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো কিন্তু প্রায় সবকটি মেয়ে এক সঙ্গে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো। বিরক্তি ও বিদ্রূপে গলার স্বর বিষিয়ে নিয়ে তারা শুনিয়ে দিল—বুঝেছি,

বেশ বুঝেছি, চৌকীদার হয়েছ। নীল কবুতরটি সেজেছ। তবে আর এখানে খাঁড়া নিয়ে সবাইকে ডরাচ্ছ কেন? নিজের ঘরকে যাওনা এবার, পথে তো বাঘ বসে নাই।

মোহন তাড়াতাড়ি অন্য পথে সরে পড়লো।

শুধু জবা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে মোহনকে, যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়ে যায়। ওকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেবার মত অহঙ্কার কোথা থেকে পায় এই মেয়েগুলি? সে তাঁতী, সে চৌকীদার, সে ভিন্‌-পাড়ার ছেলে তবু আজ সে-ই গাঁয়ের একমাত্র সুবেশ সুপরিচ্ছন্ন মানুষ। জবার সঙ্গে মেয়েদের একটা ঝগড়া হয়ে গেল।

জবা—তোরা ওকে দেখে অমন ঘেউ ঘেউ করে উঠলি কেন?

মেয়েরা—কেন করবো না? লোকটার লাজ-সরম নাই; তাকাবেক কেন আমাদিগের পানে?

জবা—খুব হয়েছে, চুপ কর। কার লাজ-সরম নাই, নিজের পানে চেয়ে দেখ।

ধূলগড়ার বিপর্যয়ের বিলাপ যেন বাতাসে ভেসে গেছে দূরান্তরে। এসেছে এক পাদরী; সুর করে শুনিয়ে যায়—গরীবের জন্য স্বর্গের দ্বার খোলা আছে। এসেছে একজন সন্ন্যাসী ডাক্তার। গোবীজের শিশি আর ছুরি নিয়ে টিকে দেবার জন্য গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সবাইকে তাড়া করে বেড়ায়। ভাগ্য গণনা করতে এসেছে এক গণকঠাকুর। গাঁয়ের গ্রহশান্তি করতে এসেছে এক সন্ত বাবাজী। আর ঘনিয়ে এসেছে পঞ্চমীর পূজো, বটতলার শিলাদেবীর কাছে জোড়া-পাঁঠার বলি না দিলে রেহাই নেই। সব দেবতার খোরাক যোগাতে নিঃস্ব ধূলগড়ার রক্ত শুকিয়ে আসে।

আহত ধূলগড়ার রক্তমাংসের গন্ধে গন্ধে কোথা থেকে এক লোন

অফিস এসে জুটেছে। লোন অফিসের আমলা আর সরকারেরা প্রায় সাতদিন ধরে খোঁজখবর নিল। বাউরীপাড়া আর তাঁতীপাড়ার যত কুঁড়েঘর চুঁড়ে, গরু আর আর মহিষের চেহারা দেখে, যেন ক্ষেতের মাটি চেখে চেখে তারা কিছু একটা স্থির করে নিল। বোঝা গেল তারা খুশি হয়েছে।

ক'দিন পরেই দেখা গেল দু'পাড়ার মাঝখানে একটা কুশে জমির ওপর নতুন টিনের একচালা উঠেছে। দাদনের ঝুলি নিয়ে বসলো লোন অফিস। আকাশের দিকে চোখ রেখে ওরা সাবধানে ঋণ ছাড়ে। আমন রবি রেহান দিয়ে চাষীরা কবলায় টিপসই মারে। শুধু নিজেরা নয়, মাটির ভবিতব্যের নাড়ীতে কোটি কোটি শশ্যভ্রূণ এই ঋণের বন্ধনে খাতক হয়ে থাকে।

দৈবের এই পীড়ন গ্রামের সকল উৎসাহকে চেপে ধরছে পাকে পাকে। শুধু ভরসা হয় মোহনকে দেখে। মোহন যদি একবার তাদের সব দুঃখ দুষ্কৃতির বার্তা নিয়ে ইউনিয়নের হৃদয় গলাতে পারে, ইউনিয়ন যদি সার্কেল কর্তাদের মর্জি মজাতে পারে, তবে সদরের কৃপা ডুকরে উঠতে কতক্ষণ?

ধূলগড়ার বটতলায় এক সন্ধ্যায় তাঁতী বাউরী সকলেই মোহনকে তাদের প্রস্তাব যথামিনতির সঙ্গে জানালো। এই একটি দিনের পরীক্ষায় মোহনের চরিত্রের চরম যাচাই হয়ে গেল। মোহন বললো—না, সে হতে পারে না। আমি গাঁয়ের চাকর নই। আমি চোর ধরব, বদমাস ঠেঙ্গাব।

তাঁতীদের সস্তা স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল আগে। ওদেরি গাঁয়ের ছেলে মোহন, সেই দীনবন্ধুর ছেলে। কিন্তু সে আজ ফিরে এসেছে কাবুলী ইংরেজের চেয়েও বিদেশী হয়ে। ধূলগড়ার ভাষা ওর মুখে বাজে না। ধূলগড়ার অভাব অপমান ও চিনতে পারে না।

তবু সারা গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র পরিচ্ছন্ন মানুষ হল মোহনবাঁশী—তারই শুধু পরিচ্ছদ আছে। গাঁ-ভরা মানুষ ও গরুর ভিড়ের মধ্যে ওর বেশভুষা ওকে এক ভিন্ন জাতের মর্যাদা দিয়েছে।

ভয় পেয়েছে বেশি বাউরী পাড়ার লোকেরা। জয়, মতি, মধু, গুণধর দূর থেকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে মোহনকে। চোখাচোখি হলেই অপরাধীর মত মুখ নামিয়ে নেয়। ছেলেবেলায় একদিন যে ওরা আর মোহন একসঙ্গে হারাণপুরের মেলায় চুরি করে সরবৎ খেয়েছিল, সে ঘটনাও আজ একেবারে মিছে হয়ে গেছে।

তবু আবার হাল ধরে সবাই। রোদেপেটা এঁটেল মাটি লাঙ্গলের মুখে উল্টেপাল্টে দেয়। কড়া মই চালিয়ে ঢেলা ভাঙ্গে। চাষী মেয়েরা পাশে দাঁড়িয়ে আগাছা বাছে, কঞ্চি দিয়ে ক্ষেতের ধুলো চৌরস করে। সব ক্ষুধা রোগ তাপ ফাঁকি হতাশার ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে ওরা আবার লেগে যায় অদৃষ্টকে শক্ত মুঠোয় ধরে রাখতে।

শুধু জবা বেঁকে বসেছে, ক্ষেতে কাজ করতে সে নারাজ। ক্ষেত ভরা একপাল মরদ, কোনো লজ্জা বালাই নেই তাদের। গায়ে একটা সুতো কুটো আছে কি না আছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বুড়ো কুঞ্জ বাউরী বার বার বুঝিয়ে বলে জবাকে—তোর ওসব চিন্তে কেন? তুই কাজ করবি মাটির সাথে। মাটির দিকে তাকিয়ে থাকবি।

জবা—না আমি পারবো নাই।

কুঞ্জ—পারতে হবে।

জবা—না পারবো নাই।

জবা সদর্পে স্পষ্ট জবাব জানিয়ে দেয়। বুড়ো কুঞ্জ তার মেয়ের

দেমাকের দাপট দেখে প্রথম একচোট মেজাজ দেখিয়ে ফেলে। গালাগালি করে। কিন্তু পরক্ষণেই এক মমতার আবেশে শান্ত হয়ে আসে। সত্যিই তো ও চেহারা রোদে জলে খাটবার জন্য নয়। ভগবান ওকে বুদ্ধি দিয়েছে, ভদ্রলোকের মত রুচি দিয়েছে। কষ্টে পড়লে কেঁদে ফেলে, অভিমান করে। ও ঠিক কানিপরা চাষার মেয়ে নয়। আসলে ও হলো দয়ারামের বৌ। এই পরিচয় জবা ভুলতে পারে না। জবা এখনো সিঁদুরের টিপ পরে; পান খায়; ছেঁড়াফাটা যে দু'একটা শাড়ি আছে, তাই দিয়ে সে আজও প্রত্যহ সাজ করতে ভোলে না।

জবা কখনো কখনো ঘরের দাওয়ায় বসে কাঠের চিরুণী নিয়ে চুল আঁচড়ায়। ঝুমকোর বেড়া ঘেঁষে, চুবড়ি কোদাল কাঁধে নিয়ে মতি বাউরী ভীরু চোখে তাকিয়ে চলে যায়। মতির গায়ে একটা মোটা বিলিতি পশমের কোট, কোথা থেকে যেন যোগাড় করেছে—বোধ হয় সহরের কোনো বাবুর বাড়ি থেকে ভিক্ষে মেগে নিয়ে এসেছে। বেঢপ জামাটার ঝুল ছেঁড়া গামছার ক্ষুদ্র অধোবাসটুকু ঢেকে ফেলেছে। তবু ঘামে ভিজে জলটোপা হয়ে চলেছে মতি। জবা অপাঙ্গে দেখে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বিদ্রূপের হাসিতে কুটিল ঠোঁটদুটো একবার নড়ে উঠলো শুধু। মতির সমস্ত মুখ চকিতে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চোখদুটো আবার পরক্ষণেই জ্বলে ওঠে।

সকাল বেলা থেকেই বটতলায় ছায়ায় এক কাপড়ের ফিরিওয়ালা এসে তার পসরা সাজিয়ে বসেছে। গাছের ডালে দড়ি টেনে ঝুলিয়ে দিয়েছে হরেক রকমের শাড়ি। কোরা ধোলাই—নানা মাপের ধুতি ভাঁজ করে থাক লাগিয়ে রেখেছে। এক পাশে ছাঁট-কাপড়ের একটা

ঢেউ লাগানো—ছিট আদ্দি শালু মলমল নয়নসুখ ; আর এক পাশে বিকীর্ণ কতগুলি জামার স্তূপ।

খদ্দেরের সমাগম দেখে ফিরিওয়ালা প্রথমে খুশি হয়ে উঠেছিল। ভুল ভাঙলো তাদের চেহারার রকম দেখে। এই প্রায়-উলঙ্গ [illegible]র জনতা—এদের রোদ-পোড়া চামড়ায় লম্বসাটপটাবৃত পৃথিবীর লজ্জাবাদ বোধ হয় এখনো সত্য হয়ে উঠতে পারে নি। এরা সত্যিই কি কিছু কিনবে ? সন্দেহ হয়।

ছোট ছোট ন্যাংটো ছেলেগুলির মাতামাতি, ছোকরাদের দর হাঁকাহাঁকি, বয়স্কা মেয়েদের প্রশ্ন, জনতার চোখভরা এক প্রখর দৃষ্টির উল্লাস—ফিরিওয়ালা কেমন ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে সব বেঁধেছেঁদে উঠে দাঁড়ালো সে। মাতবর চরণ বাউরী ও আরও দু'একজন বয়োবৃদ্ধ ফিরিওয়ালাকে অনুরোধ জানালো—এবার পূজায় এ-গাঁয়ে কেউ সওদা লিবে না হে। তুমি এইস হোলির সময়। অনেক মাল লিব আমরা।

—হাঁ, আসবো। সোনার সাজ নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য, যত খুশি নিও।

ফিরিওয়ালা কাপড়ের বোঝাটা ঘাড়ে তুলে, ঠোঁটের এক কোণে একটু হাসি মুচকে পথে নেমে পড়ে!

পঞ্চমীর পরবে বটতলার দেবতাব পায়ের কাছে মাটিটুকু শুধু রঙীন হয়ে উঠলো—জন প্রতি পাঁচ পয়সা চাঁদা ধরে এক জোড়া পাঁঠা কিনে বলি দেওয়া হয়েছে। এ উৎসবের রূপ চোখে পড়ে না। শুধু শোনা যায় তার শব্দ। শুধু উদ্দাম ঢাকের বাজনা—বিবস্ত্র ক্ষুধাজীর্ণ ধুলগড়ার শূন্য পাকস্থলী ও ফুসফুস যেন গর্জন করছে। বুড়ো বুড়ী বহুড়ী—প্রায় তিন শো মানুষের একটা জনতা। লেংটি কানি কালি ন্যাকড়া চটের টুকরো, তার ওপর এক আধটু হলুদের

ছিটে—ওদের মুখের সমস্ত হাসিরই মত বেদনা-করুণ এই উৎসবের সজ্জা। চারদিকের বাসি ও বিবর্ণ ফুল, শুকনো পাতা আর রুক্ষ মাটির সঙ্গে ওরা ছন্দে ছন্দে মিলে গেছে।

জবার কথা আলাদা। শিউলী-গোলা দিয়ে রঙানো একটা চওড়া-পাড় শাড়ি পরিপাটি করে পরেছে জবা, সিঁদুর তো আছেই; চোখে কাজলও দিয়ে ফেলেছে।

রাজনন্দিনী! অন্য মেয়েরা জবাকে দেখে ফিস্ ফিস্ করে উঠলো মুখ টিপে টিপে হাসলো। জবা যেখানে দাঁড়ায়, সেখান থেকে তারা সরে যায়। আগে জবাকে পেলেই মেয়েরা তাকে সাগ্রহে ঘিরে দাঁড়াতো। জবার গায়ের শাড়ি আর খোঁপার ফিতে ধরে তারা টানা-টানি করতো—শতমুখে প্রশস্তি গুঞ্জন করে উঠতো। কিন্তু আজ তারা যেন জবার কাজল লেপা চোখের চাউনীতে এক ক্রুর বিদ্যুতের ছায়া দেখতে পেয়েছে। জবা তাদের কাছ থেকে সরে গেছে বহু দূরে। সব কাহিনী শুনেছে তারা। দয়ারামের জন্য আজ ওদের মন কেঁদে ওঠে। বুড়ো কুঞ্জ বাউরীর কথা ভেবে দুঃখ হয়। মেয়েরা যেন জবার ছায়া বাঁচিয়ে যায়। ওরা সবাই যেন মনে মনে এই ধিক্কার দিচ্ছে—জানি জানি কী নিয়ে তোমার এই গরব।

কুঞ্জ বুড়ো বড় নির্বোধ। কোদাল দিয়ে কুপিয়ে একটা ভাঙা আলে মাটি দিচ্ছিল কুঞ্জ। জানকী বাউরী জিজ্ঞাসা করলো—কি গো কুঞ্জ দাদা, তোমার বিটি খাটতে আসছে নাই কেন?

কুঞ্জ—তোমরা কি আর মানুষ বট হে? জানোয়ারের মত নেড়া ন্যাংটা হয়ে থাকবে, লাজ সরম নাই তো তোমাদের। মেয়েমানুষ হয়ে কি করে এখানকে আসবে বল?

প্রায় দশ বারজন এক সঙ্গে কোদালের হাতল ঠেকে গর্জে উঠলো—কি বললি রে বুড়ো? তোর জবা হলো [illegible]? আর হোই যে এতগুলি বিটি মাগ মাতারী খাটছে, ওরা মেয়েমানুষ নয়? যা ঘরকে গিয়ে একবার দেখ। মোহন তাঁতী যে জাত লুটে নিচ্ছে রে কানা বুড়া। দেখ গিয়ে যা।

কুঞ্জ বুড়োর পাঁজরার ভেতর দমটা যেন আটকে গেল। বুড়ো দাঁড়িয়ে ঝিরঝির করে কাঁপতে লাগলো। এই বিদ্রূপের নিদারুণ একটা অর্থ ওর পঞ্চান্ন বছরের বাউরী জীবনের দর্পকে যেন হঠাৎ লাথি মেরে ভূমিসাৎ করে দিল।

কোদালটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে, বুড়ো একলাফে আল থেকে উঠে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটলো ঘরের দিকে। বুড়োর পেছনে সবাই চীৎকার করে ছুটে এল—থাম্ বুড়া, থাম্।

জবা সেজেগুজে বসেছিল নিকানো আঙিনার ওপর একটা তুলসী পিঁড়ার কাছে। এখন বিকেল, তার পর সন্ধ্যা। কাজের মধ্যে কিছু কাঠের চেলি যোগাড় করা। বুড়োর জন্য ফেনভাত ফুটিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু তার পরেই তো নিশুতি রাত। এই আঙিনায় সুবেশ সুন্দর এক তরুণের ছায়া, তার আকুল অনুনয় দুহাতে ঠেলে রাখতে জবা যেন আর জোর পায় না। কিন্তু ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘুমন্ত কুঞ্জ বুড়োর আর্ত নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসে। অন্ধকারের আহ্বান ব্যর্থ হয়ে যায়।

মোহন বলে—তোর জন্য আমি জাত ছাড়ছি, তোর অত জাতের মায়া কেন?

জবা—আমি তো তোকে জাত ছাড়তে বলছি না।

মোহন—তবে কি করে হবে? খাবি কি?

জবা—কেন আমি কি খাই না। আমার কি বাপ নাই?

মোহন—পরবি কি? এবার কি কানি পরে থাকবি? আর ক'টা কাপড় আছে তোর?

জবা—এই একটা।

মোহন—তারপর? কি করে তোর মান থাকবে?

জবা—তুই তো দিতে পারিস।

মোহন—আমি দেব কেন?

জবা—বেশ দিস না।

প্রতি রাত্রে আঙিনায় তুলসীপিঁড়ার কাছে এক সুস্বপ্ন একসঙ্গে ভিক্ষা ও দানের ছলনা নিয়ে আসে। আজ অনেক কষ্টে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঢাকাঢুকি দিয়ে এই জীর্ণ শাড়িটাকে জবা গায়ে জড়িয়েছে। কিন্তু একটু অসাবধানে ওঠাবসা করলেই ফেঁসে যায়। কাপড়ের আধহাত ফাকটা চিড় বেসামাল হয়ে ঠিক হাঁটুর ওপরেই নির্লজ্জ হয়ে ওঠে। এ লাঞ্ছনা জবার পক্ষে দুঃসহ।

কাল রাত্রে মোহন বলেছিল—যেদিন তুই কানি পরে পথে বের হবি জবা, সেদিন থেকে সব খতম। আমি আর আসবো না। আর ভাল লাগবে না তোকে।

ঠিক এই রকম কথা বলতো দয়ারাম। বেশভূষায় জবাকে উদাস দেখলে দয়ারাম এমনি ভাবেই তাকে শাসাতো। অন্ধকারে মোহনের চৌকীদারী মুরেঠার ঝালরটা, দয়ারামের মাথায় বাবরীর মত যেন দুলে ওঠে। জবা তার হাত-দুটিকে তবু সামলে রাখে। একটু ভুল হলেই হয়তো মোহনের গলা সবেগে জড়িয়ে ধরবে এখনি।

মোহন যাবার সময় বলে যায়—তোর রূপ আছে। সাজবি না কেন জবা?

জবা বলে—এখনি যেও না, আর কিছুক্ষণ থেকে যাও…

জবার ভাবনার আমেজ ছুটে যায়। একটা চীৎকারের তাণ্ডব যেন হঠাৎ ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে।

মাথার ওপর কুঞ্জ বুড়োর হাতের কোদালটা হিংস্র হয়ে লাফিয়ে ওঠবার আগেই সকলে মিলে তার হাত চেপে ধরলো। কুঞ্জ কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লো সেইখানে। লোকের ভিড়, মন্তব্য, ধমক আপসোস ও ধিক্কারের সেই সোরগোলের মধ্যে জবা ঘটনাটির অর্থ বুঝে নিল। বুঝে নিল জবা—তার প্রতি রাত্রের সেই তমসাবৃত কাহিনী সারা গাঁয়ের গোচরে এসে গেছে। সবাই বুঝে ফেলেছে, পঞ্চমীর বটতলায় তারা তাই মুখ টিপে হেসেছে।

জবা ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজায় আড় টেনে দিল।

ভিড় সরে গেছে। কুঞ্জ বুড়ো পা-ভাঙা বলদের মত ঘরের বাইরে অন্ধকারের মধ্যেই কাৎ হয়ে পড়েছিল। জবা এসে কেঁদে পড়লো—চল ঘরে চল।

কুঞ্জ বুড়ো—না।

জবা—এই ধরিত্রী ছুঁয়ে দিব্যি লিচ্ছি, আর কখনও আমি দোষ করবো না। আর ভুল হবেক নাই।

জবার হাতে ভর দিয়ে উঠে কুঞ্জ ঘরের ভেতর গিয়ে শুয়ে পড়লো। জবা একটা চট টেনে শুয়ে পড়লো বুড়োর পায়ের কাছে মাথা রেখে। এই ধরিত্রীর কোল থেকে কে যেন তাকে ঠেলে দিয়েছিল ক'দিনের জন্য। সেই হারানো ঠাঁই আবার পাওয়া গেছে। এক ভাবনাহীন তৃপ্তির আবেশে জবা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো।

তাঁতীপাড়া জেনেছে মোহন তাদের কেউ নয়—সে শুধু চৌকীদার। বাউরীপাড়া জানে, জবা তাদের জাতের অপমান। দুপক্ষেই বিদ্বেষ ঘনিয়ে ওঠে, কোনপক্ষের কেউ ভুলতে পারে না তাদের গোষ্ঠী

অভিমান। তাঁতীরা মনে করে, জবা তাদের পাড়ার ছেলেকে খারাপ করেছে। বাউরীরা মনে করে, মোহন তাদের সংসারে এনেছে কলঙ্কের ছাপ। সময় সময় বাউরীপাড়ার সবাই বোঝে—এ শুধু মোহনের দোষ নয়। জবা যদি একটু কড়া হত তাহলে তাদের জাতের মান এভাবে সস্তায় ও সহজে খোয়া যেত না। জবার বাপও যেন কেমন। মেয়ের ওপর শাসন নেই। সব বুঝেও চুপ করে আছে। তারও কি জাত হারাবার ভয় নেই? তবু সবাই চুপ করে এই অপমানের মার হজম করে। দৈন্যে হাহাকারে জাতের দেমাক আজ লাঠি-মারা সাপের মত মাথা গুঁজে পড়ে আছে।

কুঞ্জ বুড়ো আবার খাটতে আরম্ভ করেছে। আজকাল ওকে সকলে একটু দয়ার চক্ষে দেখে। আর ক'টা দিনই বা ওর আছে—ওকে জাতের বার করে আর লাভ কি? এমন জোয়ান মেয়ে ঘরে থাকতে ভাঙা কোমর নিয়ে বুড়ো বাপকে ধুঁকে ধুঁকে খাটতে হয়। কিন্তু মোহন তাঁতীর এ দুঃসাহস ওরা ক্ষমা করবে না। এই রোপাইটা শেষ হয়ে একবার ক্ষেত ফলে নিক, একটু সুদিন পড়ুক; তারপর দেখে নেবে তারা—তাঁতীর হাতে টাঙির কত তেজ।

তিন দিন থেকে কুঞ্জ বুড়ো একটা বিসদৃশ ব্যাপার লক্ষ্য করছে। কোনো চাষী-কামিনই ক্ষেতে খাটতে আসছে না। চাষীদের মুখভরা একটা অপ্রসন্নতা থম থম করে। নতুন জল নেমেছে। চটপট্ রোপাই সেরে ফেলতে হবে। কিন্তু আল বাঁধতেই সময় ফুরিয়ে যায়। আঁটি আঁটি ধানের চারা ক্ষেতের জলে হাবুডুবু খেয়ে পড়ে থাকে।

হৃদয় বাউরীকে পাশে পেয়ে কুঞ্জ প্রশ্ন করলো—তোমাদের ঘরের লোক কই হে। কেন আসছে নাই বলতো? ব্যাপার কি?

হৃদয়কে চুপ করে থাকতে দেখে কুঞ্জ আবার চোয়াল কাঁপিয়ে একটা হিংস্র হাসি টেনে জিজ্ঞেসা করে—মোহন তাঁতী কি সবারই···

হৃদয় জবাব দিল—তোমার বুদ্ধিতে মরণ এসেছে বুড়া। তুমি বুঝবে না। ঘরে গিয়ে নিজের বিটিকে শুধায়ে দেখ।

কুঞ্জ—তোমাদিগেরই বা বলতে এত লাজ কেন?

হৃদয়—ঘরের লোক সবাই আসবে গো আসবে। না হলে রোপাই সারবো কি করে? তুমি কিছু বুঝবে না, চুপ কর।

কুঞ্জ কি বুঝলো তা সেই জানে। বিশ্রী রকমের একটা হাসি আর হাই তুলে আবার কাজে মন দিল।

বাঁশবনের ডোবাটা দুপুর বেলাতেও একেবারে নির্জন। কাটা তালগাছের একটা খণ্ড ডোবার কিনারায় জলের মধ্যে কাছিমের মত পিঠ ভাসিয়ে পড়ে থাকে। জবা সেখানে বসে বসে দুধিয়া মাটি দিয়ে তার শেষ শাড়িটাকে খুব সাবধানে কেচে নিল। শাড়ির পাড়টাতে এখনো কিছু জোর আছে, কিন্তু সুতোগুলি থেৎলে তুলোট হয়ে গেছে, তালি সেলাই আর ধরে না। খুব সামলে কাচতে গিয়েও আবার দু'জায়গায় ফেটে গেল।

শাড়িটাকে আঙিনায় মেলে দিয়ে জবা ঘরের ভেতর বসে রইল। নিজের কাছ থেকেই সে যেন লুকিয়ে ফিরছে। ঘরের কোণে বসে জ্বরের জ্বালার মত এক অস্বস্তিকর লজ্জায় জবা ছটফট করতে লাগল।

শাড়িটা শুকিয়ে গেলে তুলতে এসে জবা দেখলো—খড়খড়ে কাগজের মত হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও কাপড়টাকে অন্যদিনের মত আর ছাঁদ করে গায়ে জড়ানো গেল না। পুরানো পলকা চাটাইয়ের মত ভেঙে ভেঙ্গে যায়। দারুণ ঘৃণায় এক টান মেরে শাড়িটাকে সরিয়ে ফেলে দেয় জবা। না আর সহ্য যায় না, উলঙ্গ ধূলগড়ার ষড়যন্ত্র এতদিনে বোধ হয় চরম হয়ে উঠেছে।

রাত্রি একটু গভীর হয়ে আসতেই জবা ঘরের বাইরে আঙিনার ওপর এসে দাঁড়ায়। মোহনের পায়ের শব্দে অনেকদিন পরে আবার অন্ধকারে রোমাঞ্চ জাগায়।

মোহন—কি হয়েছিল তোর জবা? এতদিন দেখা দিলি নাই কেন? তুই দেখছি, হয় আমাকে মারবি, নয় পাগল করে ছাড়বি।

জবা—তুই রোজ এসে ফিরে গেছিস, না?

মোহন—তবে? সেদিন বিছা কামড়ে শরীরটা জ্বালায়ে দিলে, তবুও দাঁড়িয়েছিলাম।

মোহনের উত্তরগুলি জবার সব সংশয় দ্বিধা বিবেচনার ওপর যেন মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে তাকে বিবশ করে আনে। একটা টাল খেয়ে মাটির ওপর বসে পড়লো জবা। মোহন ব্যস্ত হয়ে ধরে তুলতে যেতেই শাড়ির একটা ভাগ খুলে গিয়ে তার মুঠোর ভেতর ঝুলতে লাগলো।

মোহন—একি জবা, তুই কানি পরেছিস।

জবা—হ্যাঁ।

মোহন—এই তোর ইচ্ছে?

জবা—না।

মোহন—আনবো শাড়ি? নিবি তো? বল, তুই একবার হাঁ বলে দে।

জবা—হাঁ।

মোহন—কালই নিয়ে আসছি।

মোহন চলে গেলে তুলসীপিঁড়ার কাছে সংজ্ঞাহীনের মত জবা বসে রইল অনেকক্ষণ। বসনে ভূষণে প্রসাধনে চর্চিত এক আন্-দুনিয়ার আলোকের ধাঁধাঁয় ধুলগড়ার পথ হারিয়ে গেছে তার—চিরদিনের জন্য। জাত-মান, ক্ষেত, বাগান, বটতলার শিলা—সরে গেছে বহুদূরে। কোনো মমতা তাকে আর ধরে রাখতে পারলো না।

তাদের ঝুমকোর বেড়ার ধার দিয়ে যেন অনেকগুলি ছায়ামূর্তি দল বেঁধে যাচ্ছে। কতগুলি পায়ের শব্দে চমকে উঠলো জবা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জবার ভীত বিস্মিত ও অলস চোখের ঝাপসা দৃষ্টি ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে এল। মুক্তির পথ পাওয়া গেছে, খোলা পড়ে রয়েছে। সবাই সে পথে চলেছে। রাত্রিচর পাখির মত উল্লাসে যেন ডানা ঝাপটে ঝুমকোর বেড়াটা ডিঙিয়ে তাদের সঙ্গে গিয়ে মিশে গেল।

গঞ্জ থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। সারাদিনের মধ্যে সামান্য একটু জল-বাতাসাও পেটে পড়ে নি মোহনের। পয়সা ছিল না। তের টাকা নগদ দিয়ে আর কিছু ধার বাবদ লিখিয়ে পাল-বাবুদের দোকান থেকে একজোড়া শাড়ি কিনে এনেছে মোহন—নক্সা-করা একটা নকল বারাণসী, আরও একটা মিলের মিহি শাড়ি। সারা দুপুর রংরেজের ঘরে বসে সামনে থেকে ছোপিয়ে নিয়েছে, যার জন্য খরচ পড়েছে সাত টাকা। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, নিজের জন্য একটা বুটিদার তোয়ালে কেনে। কিন্তু সব সঞ্চয় তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার যৌবন নিশীথের স্বপ্নোপকূলে, এক ছায়া-মদির বিদেশের ঘাটে তরী আজ ভিড়েছে। উচিত শুল্ক দিতেই হবে। এ এক আত্মহারা আনন্দ, নিঃশেষে ফুরিয়ে যাওয়ার সুখ।

রাত্রির মাঝ প্রহরে ফেউয়ের দল একবার চীৎকার বন্ধ করলো। গুঁড়ো বৃষ্টির ছাঁট মোহনের চোখে মুখে লাগছে। তুলসীপিঁড়ার কাছে পাট করা একজোড়া শাড়ি—যেন তার একজোড়া ইহ-পর পরিণাম সঁপে দিয়ে মোহন আঙিনার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। জবা তখনো বুঝি ঘরের ভেতর আছে।

আঙিনার কোণে কোণে জলে ভেজা পাতার গাদায় মরা জোনাকীরা আলো ছাড়ে। মোহন অস্থির হয়ে ওঠে। এই রাত্রের

সব গভীরতা, সব মুহূর্ত যে জবার প্রতিশ্রুতির ছোঁয়ার পরম মূল্য লাভ করেছে।

মোহন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে—বেড়ার ফাঁকে কুঞ্জ বুড়োর শ্বাস-বায়ু ফাটা হাপরের মত হাঁসফাঁস করছে। আর ধৈর্য ধরার সাধ্যি নেই, মোহন দরজার আড় সরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। চকমকি ঘষতেই দেখা গেল—ঘরে আর কেউ নেই। শুধু ঘুমোচ্ছে কুঞ্জ বাউরী। জীর্ণ কদর্য অস্থিপেশীর একটা কৃত্রিম মানুষী সজ্জা বৃথা দম টেনে টেনে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।

মোহনের মাথায় শিরায় যেন পাগলামীর বান ডেকে গেল। এক লাফে ঘর থেকে বার হয়ে একটা থাবা দিয়ে শাড়ি-জোড়া তুলে নিল মোহন। আর এক হাতে টাঙিটা শক্ত করে ধরে আঙিনা পার হয়ে পথের অন্ধকারে মিশে গেল। জবা কোথায়?

বাউরী পাড়ার প্রত্যেকটি কুঁড়ের দুয়ারে, বেড়ার ফাঁকে, মেটে পাঁচিলের মাথায়, মরাই মাচানের অন্ধকারে মোহনের চোখ কান আর ধারালো টাঙি উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে ঘুরে গেল। জবার সন্ধান পাওয়া গেল না।

মনে পড়লো, মতি বাউরীকে। তাগড়া চেহারা ছোঁড়ার, ওরি সঙ্গে জবার সাঙ্গা-বিয়ের কথা উঠেছিল একবার। কোথায় সে?

মতি শুয়েছিল একটা ছোট খড়ের বোঝা বুকে আঁকড়ে, বাথানের বাইরে। মতি একাই বাথান পাহারা দেয়। নেকড়ে হায়নার ভয় নেই ওর—যেমন গরীব তেমনি সাহসী। মোহন তাকে স্বচক্ষে একবার দেখে নিয়ে তবে শান্ত হলো।

জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের পাহারা দিল মোহন; শুনে গেল ঘরে ঘরে ক্ষুধার্ত হাড়েরা ঘুমের ঘোরে দাঁত পিষছে। কোনো ঘরে একটিও প্রদীপ জেগে নেই। কোনো নিভৃতে বীতনিদ্র প্রণয়ের সম্ভাষ

অসাবধানে বেজে ওঠে না। শুধু কাঁদে শিশুর দল—তৃষ্ণার্ত ছোট ছোট জিভের বিলাপ রাত্রির স্থৈর্যকে শঙ্কাতুর করে তোলে। তাদের সান্ত্বনা দিতে কেউ জেগে ওঠে না কেন?

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এল মোহন। জবা পালিয়েছে—তবু মনে হয়, এই জলো হাওয়া আর অন্ধকারের মত সে যেন কাছেই আছে—অধরা হয়ে। বস্তি পার হয়ে গাঁয়ের সীমানায় একটা করঞ্জ গাছের তলায় মোহন এসে দাঁড়ালো।

মোহন বোধ হয় ঝিমিয়ে পড়েছিল। চোখ মেলে চাইতেই বুঝলো সে গাছে ঠেসান দিয়ে আছে। অবসাদে সমস্ত শরীরটা একটা মরা ডালের মত বেঁকে চুরে গাছের গায়ে নেতিয়ে লেগে আছে। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে।

ক্ষেতের আল ধরে কারা যেন আসছে। এক দুই তিন—অনেক। হেমন্তের শিশিরে উদভ্রান্ত একদল শৃঙ্গারাদ্রা হরিণী যেন ত্রস্তপদে ছুটে আসছে, গাঁয়ের দিকে।

রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে ক্ষেতে রোপাই সেরে ফিরছিল বাউরী মেয়েরা। আজ রাত্রের মত কাজ শেষ, আর সময় নেই।

ওরা আসছিল—বিবসনা মৃত্তিকাবধূর দল। টুকরো টুকরো কানি চট কাঁথা—মধ্যদিনের যত রুচি পরমাদ, আজ রাত্রের মত পরম অবহেলায় ওরা ঘরেই ফেলে রেখে এসেছে। ওদের লজ্জা ঘিরে রেখেছে লক্ষ কালো সুতার জালে তৈরী এই নিঃসীম অন্ধকারের পরিচ্ছদ।

চৌকীদার মোহন অনিমেষ চোখে, জোড়া শাড়ি বুকে আঁকড়ে করঞ্জ তলায় নির্জীবের মত পড়েছিল জলকাদা মাখা সেই মূর্তিগুলি তারই সুমুখ দিয়ে দল বেঁধে হেঁটে চলে গেল তর্ তর্ করে। ওদের বেণী-ভাঙা রুক্ষ চুলের ভার পিঠের ওপর ঘষা খেয়ে শব্দ করছে।

নিরাবরণ দেহের প্রতিটি পেশী মাংসের নূপুরের মত অদ্ভুত শব্দ করে বেজে চলে যাচ্ছে।

—বেলা চমকাচ্ছে যে গো। জলদি কর। তাদেরই মাঝখানে থেকে জবা বলে উঠলো।

পূব আকাশের দিকে একবার চকিতে চোখ চেয়ে, করমচা তলা দিয়ে ব্যস্তত্রস্ত হয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল গাঁয়ের মেয়েরা। খগ মৃগ মধুপের সাড়ায় এখনি জেগে উঠবে পৃথিবী। ওরা শুধু ভয় পাচ্ছিল এখুনি বুঝি সূর্য উঠে পড়ে।

গল্পালোক | হৃদ্‌ঘনশ্যাম

হৃদ্‌ঘনশ্যাম

শুঁয়াপোকাটা দেয়ালের গা ধরে এগিয়ে আসছে—কুৎসিত নির্বোধ ও ভীরু ক্ষুদ্র একটি রোমশ সর্বনাশ যেন কেৎরে কেৎরে এগিয়ে আসছে ; এই পোকাটাও একদিন প্রজাপতি হয়ে যাবে। বসন্তের বাতাসে এরই বিচিত্র পাখা থেকে রঙীন ধুলো ঝরে পড়বে। একথা বিশ্বাস করতে বাধা নেই ; খুব বেশি আশ্চর্য হই না। কিন্তু শ্যামুও সাধু মহারাজ হয়ে যাবে, একথা কখনো মনে আসে নি, এখনো বিশ্বাস করতে পারি না। এটা যেন এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক অনিয়ম।

সুবেনদা বললেন - কিন্তু তাই যে হয়েছে।

কুঞ্জবাবু বললেন— শ্যামু শ্যামুই আছে, শুধু ভোল বদলেছে।

চরণ ডাক্তার বললেন—বহুজন দুঃখায় বহুজন অহিতায় চ। এবার বেশ পাকা বন্দোবস্ত করে পরের সর্বনাশ করছে।

শুঁয়াপোকাটা টুপ করে টেবিলের ওপর পড়ে গুটিয়ে রইল। শ্যামুও ঠিক এইভাবে এক একদিন আমাদের পায়ের কাছে অসহায়-ভাবে গুটিয়ে পড়ে থাকতো—এ যাত্রা বাঁচিয়ে দাও নিতুবাবু। ভবিষ্যতে আর কখনো হবে না।

মনে পড়ে, শ্যামুর কাজ ছিল গুলি খেয়ে নেশা করা আর জুয়ো খেলা। রোজগার ছিল স্টেশনে হাঁক দিয়ে বিক্রী করা - লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি, এক আনা প্যাকেট। কতবার কত অপরাধের দায়ে ধরা পড়েছে শ্যামু। আমরাই ওকে রক্ষা করেছি। টাকা দিয়েছি, মোকদ্দমার খরচ যুগিয়েছি। তারপর সাবধান করে দিয়েছি।

শ্যামুর কাছে শুনেছিলাম, ওর পিতৃদেব নাকি এক অতি বিত্তশালী ও অতি নিষ্ঠুর জমিদার। এমন বাপ না মরলে শ্যামু আর ঘরে ফিরবে না। সেই ক'টা দিন সে আমাদেরই দয়ার আশ্রয়ে কাটিয়ে দিতে চায়। তারপর, সম্পত্তি পাবার পর প্রত্যেকটি রূপোর দেনা সে সোনার ওজনে শোধ করে দেবে।

শ্যামু উধাও হয়েছিল প্রায় দশটি বছর। আজ আবার নতুন করে ওর নাম শুনছি—লোকের মুখে মুখে। লোকটি সেই বটে, সে নাম আর নেই। শ্যামু এখন বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যাম। আশ্রম করেছে; অন্তত শত পাঁচেক দীক্ষিত শিষ্য ও শিষ্যা আছে। ভক্ত ও অনুরাগীর সংখ্যা আরও পাঁচ শত।

প্রতি সন্ধ্যায় শ্যামুর আধ্যাত্মিক মহিমার বহু কীর্তিকাহিনী কানে শুনতে পাই; নিত্য নতুন সব অলৌকিক ঘটনা—বিচিত্র ও অদ্ভুত। বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যামের মহিমা অদৃশ্য এক জালের মত দূর দূর দেশের ব্যারিস্টার, ডাক্তার, জমিদার ও মার্চেণ্টদের ভক্তিবিগলিত হৃদয়গুলি যেন ছেঁকে এনে ফেলেছে তার আশ্রমের আঙিনায়। কিমাশ্চর্যমতঃ-পরম্। যা শুনছি তা সবই বিশ্বাস হয় না। মনে হয় অনেক কিছু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, শ্যামু কিছু একটা কাণ্ড করার চেষ্টা করছে নিশ্চয়। কোনো বড় রকমের দাঁও মারার মতলবে আছে।

সুরেনদা, চরণ ডাক্তার ও কুঞ্জবাবু—ব্যাপার দেখে সব চেয়ে বেশি চটে গেছেন। মানুষের বিশ্বাসেরও তো একটা রীতি-নীতি আছে। যে কোনো একটা উজবুগ জটা চিমটে নিয়ে দুটো ধর্মের বুলি ছাড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবতার বানিয়ে ফেলতে হবে—এতটা মতিভ্রম শিক্ষিত লোকেরও কি করে হয়? শ্যামু যতই ঘুঘু লোক হোক, অন্তত গুরু-অবতার সাজবার মত মার্জিত ধূর্তামিও যে ওর নেই।

সবাই বললেন—শ্যামুকে একবার শাসিয়ে দিলে হয়; এই ভড়ং

ছাড়ুক, নইলে সব পুরনো কুকীর্তি সাক্ষী-প্রমাণ দিয়ে ধরিয়ে দেব। আশ্রমবাজি বেরিয়ে যাবে।

বললাম—যদি গ্রাহ্য না করে?

চরণ ডাক্তার—চেলাচেলীগুলিকে সব কথা বলে ঘাবড়ে দেব। তা'হলেই শ্যামুর চাক ভেঙ্গে যাবে।

গুড ফ্রাইডের ছুটীর একটি দিনে মোটর বাসে চারটি ঘণ্টা সফরের পর ট্রাঙ্ক রোডের একটা বাঁকে এসে থামলাম। বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যামের আশ্রম দেখা যায়—বাগান, পুকুর ও মন্দির। পাশে একটা শালবন—তপোবনের মত চেহারা। শীর্ণ একটা নদী আশ্রম-উদ্যানের প্রান্ত ছুঁয়ে চলে গেছে। পরেশনাথ পাহাড়ের ঘন নীল ছায়ায় আকাশের ছবিটা আরও স্নিগ্ধ।

আশ্রমে ঢুকেই প্রথমে মন্দিরের দিকে চললাম। শ্যামু বড় শিব-ভক্ত ছিল জানতাম—হয়তো শিবমূর্তি বসিয়েছে।

মন্দিরের ভেতর উঁকি দিয়ে আমরা চারজনেই চারটি পাথরের থামের মত স্থির হয়ে গেলাম। এমন ভয়াবহ, এমন অপার্থিব, এমন প্রচণ্ড বিস্ময়কর দৃশ্য কখনো কল্পনায়, অনুভব ও অভিজ্ঞতায় জীবনে আমরা দেখি নি।

শ্যামু বসে ছিল। মন্দির ঘরে কোনো ঠাকুর দেবতার মূর্তি বা ছবি ছিল না, একটা শিলাবেদীর ওপর বাঘের ছাল পেতে স্বয়ং শ্যামু জীবন্ত বিগ্রহের মত সমাসীন—বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যাম।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক গরদের ধুতি ও চাদর পরে, একটা ঝালর লাগানো প্রকাণ্ড পাখা নিয়ে বাবাজীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন ও ব্যজন করতে লাগলেন।

একদল মহিলা মন্দির ঘরে ঢুকলেন—আমাদের একটু সরে দাঁড়াতে হলো। আমাদের প্রথম হতভম্বতা যেন একটু একটু করে

কেটে যেতে লাগলো।

শ্যামুর চেহারাটা আর একবার উঁকি দিয়ে দেখলাম। শুঁয়া-পোকা ঠিক প্রজাপতি হয় নি—অজগর হয়েছে। বপুটি যেমন নধর তেমনি বিরাট; অতি মূল্যবান ও মসৃণ রেশমের গৈরিক বেশ। মেদ-চিক্কণ অবয়বে একটা অসাধারণ সুখ-সন্তোষ ও সাফল্যের দীপ্তি। সুরেনদা হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে প্রায় প্রণাম করে ফেলেছিলেন। একটা চাপড় দিয়ে জোড়-করা হাত দুটো ছাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু সুরেনদার চোখ দেখে বুঝলাম যে, তাঁর সম্বিৎ তখনো তেমনি ভোঁ মেরে আছে।

বাবাজী তখন পর্যন্ত চোখ বুঁজেই ছিলেন। আর কতক্ষণ থাকবেন বুঝলাম না। ধৈর্য আর ধরে রাখি কতক্ষণ? বুঝলাম, যার সঙ্গে লড়তে হবে, সে আর শ্যামু নয়; সে সত্যই হৃদ্‌ঘনশ্যাম। আশ্রমে ঢুকবার আগে পর্যন্ত যে বে-পরোয়া সাহস মনের মধ্যে শানিয়ে রেখেছিলাম, প্রথম দেখার আঘাতেই যেন তার খানিকটা ধার কমে গেল। কিন্তু এই তো সূচনা! বাবাজী একবার চোখ খুলে আমাদের দেখুক। তারপর দেখি কোন্ দিকে ঝড়ের গতি চলে।

বাবাজী চোখ খুললেন না; শুধু হাসতে লাগলেন—অদ্ভুত রহস্যময় অথচ তীক্ষ্ণ সেই হাসি। গরদ-পরা ভদ্রলোক জোরে জোরে বাতাস করতে লাগলেন।

বাবাজীর গলা থেকে শান্ত আবেগভরা কয়েকটি কথা বেজে উঠলো—এতদিনে তারা এল। আসতেই হবে। একে একে সবাইকে আসতে হবে।

মন্দিরের সমাগত সকল পুরুষ ও মহিলা কৌতূহলভরা দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দেখতে লাগলেন। একজন ভদ্রলোক এসে সবিনয়ে বললেন—ভেতরে এসে বসুন।

ভেতরে গিয়ে বসলাম। বাবাজী আবার স্থির হয়ে গেলেন। বোধ হয় নিঃশ্বাস পড়ছে না। ঠোঁট দুটো সেতারের তারের মত কাঁপছে—আর সেই সঙ্গে বহুদূরে কোনো শালবনে চাকভাঙা মৌমাছির গুঞ্জরণের মত একটা শব্দ।

সমাগত নরনারী এক সঙ্গে প্রণাম করে উঠে পড়লো। প্রণবের ক্লাস শেষ হলো। প্রত্যহ সকাল বেলা একবার করে হয়।

বাবাজী যখন চোখ মেললেন, তখন ঘরে আমরা চারটি অবিশ্বাসী অভাজন ছাড়া মাত্র গরদপরা ভদ্রলোক আছেন। এঁর নাম পরমবাবু; তাঁর ইহলৌকিক যথাসর্বস্ব এই আশ্রমকেই দান করে দিয়েছেন। বলতে গেলে ইনিই বাবাজীর প্রধান শিষ্য। আশ্রমের এক্সিকিউটিভ ইনিই।

বারকোশে সাজানো নানারকম মিষ্টি ও নোনতা খাবার, চা এবং সরবৎ পৌঁছে গেল।

বাবাজী বললেন—আজ তোমাদের সেবা করবার সুযোগ পাব, একথা আমি আগেই জানতাম। তাই কাল রাত্রি থেকেই তৈরী হয়ে আছি। হ্যাঁ, তারপর আছ কেমন সুরেনবাবু?

সুরেনবাবু আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন—তা আপনি সেবাটেবার কথা ওসব কি বলছেন? আপনি সেবা করবেন, না আপনাকেই···

সুরেনদার দিকে তাকিয়ে শুধু একবার চোখের ইঙ্গিতেই ভৎর্সনা করলাম। সুরেনদা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সামলে গেলেন।

পরমবাবু একবার বাইরে গেলেন। সুযোগ পেয়ে এইবার জিজ্ঞাসা করলাম—এসব কি কাণ্ড শ্যামু?

বাবাজী হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললাম—হাসলে কথার উত্তর দেওয়া হয় না। তোমাকে বলতে হবে কেন এসব করছো। আমাদের কাছে বাজে কথা বলে নিষ্কৃতি পাবে না।

বাবাজী হাসতে লাগলেন। হাসির প্রতিধ্বনিতে মন্দির ঘরের বাতাস গম্‌গম্‌ করতে লাগলো। শুধু হেসে চলেছেন। হঠাৎ দৃশ্য পরিবর্তন। বাবাজী একেবারে স্তব্ধ। শান্ত গম্ভীর মুখ—দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো। বাবাজী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার সহজ হয়ে গেলেন।

আবার বলতে যাচ্ছিলাম, কুঞ্জবাবু কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে আপত্তি করলেন। কী করবো ভাবছি, বাবাজী বলে উঠলেন—নিতুবাবু, তোমরা এবার একটু কষ্ট কর। ওরা সবাই অপেক্ষা করছে। কেষ্টকথাটা সেরে ফেলি, তারপর গল্পগুজব করা যাবে। তোমরাও এস সবাই।

বাবাজী গাত্রোত্থান করলেন।

কেষ্টকথা শোনবার অধিকারী সবাই হতে পারে না। বাবাজী যাদের মনোনীত করেন, শুধু তারাই শোনে। আশ্রমের উত্তর দিকে একটা লতামণ্ডপের পাশে অল্প প্রশস্ত একটি ঘর। দুটি প্রৌঢ়া, একটি তরুণী এবং জনদশেক বৃদ্ধ প্রৌঢ় ও যুবক আগে থেকেই সেই ঘরে বসেছিল। আজকের দিনের মত এরা ছাড়পত্র পেয়েছে।

বাবাজী ও প্রধান শিষ্য পরমবাবুর সঙ্গে আমরা চারজনও ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘরের দেয়ালে একটি বহু পুরাতন ছেঁড়া ময়লা ক্যালেণ্ডার টাঙানো। ক্যালেণ্ডারের ছবিটি হলো মুরলীধারী কৃষ্ণ—স্থানে স্থানে আবীর ও চন্দনের ছিটে লেগে আরও বিচিত্র হয়ে রয়েছে।

বাবাজী ধ্যানে বসলেন। সমবেত সকলেই চোখ বুঁজে ফেললো।

সুরেনদা তো প্রায় সমাধিলাভ করে ফেলেছেন বলেই মনে হলো। দেখলাম কুঞ্জবাবু মিট্‌মিট্‌ করে একবার আমার দিকে তাকিয়ে শেষে চোখ বুঁজে ফেললেন। এই ঘরভরা এক অভিনব আধ্যাত্মিক সুষুপ্তির মধ্যে শুধু আমারই চোখ দুটো আশঙ্কায় জেগে রইল।

শুনলাম বাবাজী আস্তে আস্তে অস্পষ্ট স্বরে একটা ভজন গাইছেন। এ ভজন কোনো কবির রচনা নয়। এই ধ্যানের আবেশে বাবাজী যা দেখছেন, সেই সব ঘটনা আপনা থেকেই সুর বেঁধে গানের রূপে তাঁর গলা থেকে বার হয়।

হঠাৎ বাবাজী চীৎকার করে কীর্তনের সুরে গেয়ে উঠলেন—গোঠে গোকুলে বেণু বাজে। বাবাজী আকুল হয়ে মাথা দোলাতে লাগলেন। এক একবার হাত দিয়ে কান দুটো ঢেকে রাখছেন—যেন সেই বংশীধ্বনি তাঁর মরমে প্রবেশ করে মনপ্রাণ খাবলাচ্ছে।

আবার চুপ। বাবাজী নিষ্কম্প দীপশিখার মত সুস্থির ভাবে যেন জ্বলজ্বল করতে লাগলেন। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা এভাবে কেটে গেল। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস ঘরের ভেতরে এসে হুটোপুটি করতে আরম্ভ করলো। খর্‌খর্‌ করে নড়ে উঠলো দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটা।

—শুনে নে, যে আছিস শুনে নে। বাবাজী পাগল রোগীর মত ছটফট করে চেঁচাতে লাগলেন। তারপরেই দেয়ালের গায়ে একেবারে এলিয়ে পড়ে চুপ করে গেলেন। শুধু ঠোঁট দুটো কেঁপে বিড়বিড় করতে লাগলো।

সোহং! সোহং সোহং! সকলেই শুনছে, ক্যালেণ্ডারের কৃষ্ণ কথা বলছে। দেখতে পাচ্ছি, চরণ ডাক্তারের হাতের রোঁয়াগুলি শিউরে খাড়া হয়ে গেছে। একজন বৃদ্ধ মূর্চ্ছা গেলেন। বাকী সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে কাঁপতে লাগলো।

একটি মিনিট মাত্র। বাবাজীর কাশির শব্দের সঙ্কেত বুঝিয়ে দিল—সমাপ্ত।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আশ্রমের অতিথিশালার একটি ঘরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। আছি মাত্র তিনজন। সুরেনদা সরে পড়েছেন দল ছেড়ে। তিনি বাবাজীর আশে পাশে ঘুরঘুর করছেন। মরমে মরে গিয়ে বুঝলাম—হারাধনের একটি ছেলে এই যে হারালো, আর ফিরছে না। বাবাজীর একটি শিষ্য সংখ্যা বাড়লো।

এইবার সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম। শেষে কি একে একে নিভিবে দেউটি? যারা ভড়কাতে এল তারাই ভিড়ে গেল। সুরেনদার বিশ্বাস-ঘাতকতায় বাবাজী যেন আমাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের ওপর তুরুপ মেরে গেলেন। পরাজয়ের অপমানটা ভাল করেই গায়ে বিঁধলো।

বললাম—কুঞ্জবাবু। শ্যামুকে তো একলা পাওয়া যাচ্ছে না। এবার একটু উদ্যম নিয়ে লাগুন, বাগিয়ে ধরা যাক। শুধু ওর মতলব আর এই দশ বছরের হিস্‌ট্রি জেনে নেব। তারপর এস-ডি-ও সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত করে, সব ব্যাপার ফাঁস করে, আশ্রমটা ভেঙে ফেলবার...

কুঞ্জবাবু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। চরণ ডাক্তার বললেন—একটু ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে। ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

পরমবাবু খবর নিয়ে এলেন—বাবাজী বেড়াতে যাচ্ছেন শালবনে। আপনাদের ডাকছেন।

ভাবলাম, এই আর একটা সুযোগ। শালবনের কোনো এক নিভৃতে শ্যামুকে বাগিয়ে ধরতে হবে। কিন্তু বেড়াতে বার হয়েই খানিকটা দমে গেলাম। বাবাজীর সঙ্গে আরও দশবারোজন অন্তরঙ্গ চলেছেন। সুরেনদা বাবাজীর গা ঘেঁষেই চলেছেন।

আমরা তিনজন পেছনেই ছিলাম। বাবাজী দুবার ডাক দিলেন—ওগো নিতুবাবু, পেছিয়ে কেন? আমার সঙ্গে এস।

কুঞ্জবাবু প্রায় দৌড়েই এগিয়ে গিয়ে বাবাজীর পাশে পাশে চলতে লাগলেন। রাগ হলো, কিন্তু উপায় নেই। আছি শুধু সুযোগের অপেক্ষায়। শুধু শ্যামুকে নয়, সুরেনদাকেও ন্যাজেগোবরে নাজেহাল করে ছাড়বো। আর কুঞ্জবাবুর ব্যবহারটাও…

চলেছি। আগে আগে বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যাম, ভক্ত শিষ্য ও অন্তরঙ্গের দল শনিগ্রহের বলয়ের মত ঘিরে চলেছে। পেছনে মাত্র আমরা দুটি অবিশ্বাসী ধূমকেতু যেন তাড়া করে চলেছি—কিন্তু নাগাল পাচ্ছি না।

পাথুরে সড়কটা ধরে অনেক দূর এসেছি। এইবার রেল লাইনটা পার হয়ে মাঠে নামবো, তারপরে শালবন। শ্যামু গল্প আলাপ ও হাসিখুশিতে নিজে মাতোয়ারা হয়ে এবং প্রায় পনেরটি ভক্তহৃদয়ের ফানুস উড়িয়ে তেমনি হনহন করে চলেছে।

হঠাৎ সকলে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—বাবাজী থামুন, থামুন। লাইন ক্রস করবেন না।

নাইন আপ ধোঁয়া ছড়িয়ে হু-হু করে দৌড়ে আসছে। বাবাজী একটু হকচকিয়ে তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। ট্রেনটা কি জানি কিসের জন্য ক্রমেই মন্থর হয়ে, একটু দূরে এসে থেমে গেল।

পরমবাবু বললেন—এবার এগিয়ে চলুন বাবাজী। ট্রেন তো থেমে গেছে।

—হ্যাঁ, থেমে যেতেই হবে, চলো। বাবাজী হাসলেন। অতি গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বে ভরা সেই হাসি।

বাবাজী আবার এগিয়ে চললেন। দেখলাম কুঞ্জবাবু চট করে ঝুঁকে পড়ে বাবাজীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। দৃশ্যটা বিশ্বাস

করতে পারলাম না। বললাম্—কি ব্যাপার চরণবাবু? কুঞ্জবাবু শ্যামুকে প্রণাম করলেন মনে হচ্ছে?

চরণ ডাক্তারেরও মনের ভেতর অবিশ্বাসী ইঞ্জিনটার গর্জন যেন থেমে এসেছে। বোধ হয় দম ফুরিয়ে এসেছে। তাই কোনো মতে হাঁসফাঁস করে উত্তর দিলেন—তা প্রণাম করতে দোষ কি, বোধ হয় গায়ে পা ঠেকেছে।

বললাম—পা ঠেকলে প্রণাম করতে হবে শ্যামুকে?

চরণ ডাক্তার আর কোনো উত্তর দিলেন না। এক সঙ্গে রাগ পরাজয় আর অপমান বোধে কিছুক্ষণের জন্য আমার সমস্ত অন্তরাত্মা মারমূর্তি হয়ে রইল। এদের সঙ্গটাও ঘৃণ্য মনে হতে লাগলো। বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে—নইলে কীই বা এমন ভেল্‌কি এঁরা দেখলেন যে বিস্ময়ে আকাট মেরে গেলেন। ছেলে-বেলায় স্কুলে পড়া গোল্ডস্মিথের সেই লাইনটা বারবার মনের মধ্যে চাবুক মারছিল। শেষে তাই হতে চললো। দোজ হু কেম টু স্কফ রিমেইনড টু প্রে।

মনের প্রতিবাদ চেপে রাখতে পারলাম না। আর বেড়াতে না গিয়ে, একাই আশ্রমে ফিরে এলাম। আজ রাত্রের মোটর বাসেই টাউনে ফিরে যাব।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। অতিথি-শালার ঘরে আর কেউ নেই। বাইরে থেকে একটা সোরগোলের রব শোনা যাচ্ছে। মনে পড়লো, আমাকে যেতে হবে। সুরেন দা ও কুঞ্জবাবু আজ বোধ হয় কেউ টাউনে ফিরছেন না। এক যদি চরণ ডাক্তার শুধু ফেরে। সে রকমও কোনো লক্ষণ দেখছি না। এতক্ষণে শালবন থেকে চরে ফিরেছেন নিশ্চয়। যাবার আগে দুকথা মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়ে যাব। শ্যামুকে নয়—আমারই সতীর্থ শিক্ষিত বন্ধু দুটিকে।

পরমবাবু একটা আলো হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন—একি আপনি এখনো বসে রয়েছেন! ওদিকে যে…চলুন চলুন। জীবনে এ দৃশ্য দেখবার সুযোগ পাবেন না। যিনি মুক্ত, যিনি ভগবান পেয়েছেন, যিনি ত্রিকালজ্ঞ—তাঁর ইচ্ছাশক্তি, আহা! সে ইচ্ছা-শক্তিকে ঠেকায় কে?

চমকে উঠলাম। কিছু ভয়ানক একটা ঘটেছে। বোধ হয় আকাশ থেকে ফুলটুল পড়ছে; কিম্বা মাটি ফুঁড়ে সরবৎ!

—কী ব্যাপার পরমবাবু?

—কুকুর ভোজন।

—সে কি?

—হ্যাঁ, বাবাজীর আদেশ নির্দেশ ও ইচ্ছা। তাঁর কাছে জীব শিব একই। বাগানে পাত সাজানো হয়েছে—দস্তুর মত আসন করে। খিচুড়ি ও মাংস রান্না হয়েছে। পাতে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—কুকুররা এসেছে খেতে?

—আসবে আসবে। সেই জন্যই তো বলছি উঠুন। এ দৃশ্য দেখে নিন। বাজারে গিয়ে ময়রার দোকানের কুকুরদের যথাবিহিত সৌজন্যের সঙ্গে নেমন্তন্ন করে আসা হয়েছে।

উঠলাম। চরণ ডাক্তার বোধ হয় অনেক আগেই গিয়ে জুটেছেন। এ দৃশ্য দেখবো, ধন্য হব, তারপর হয়তো আত্মহত্যাও করে ফেলবো। পরমবাবুর সঙ্গে নেমন্তন্নের আসরের দিকে চললাম। যাবার পথে দেখলাম, বাবাজী মন্দিরঘরে একা ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। তিনি এখন এভাবেই থাকবেন। কুকুরভোজন সমাধার পর নিজে অন্ন গ্রহণ করবেন। তার আগে নয়।

যেতে যেতে পরমবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—কুকুরদের নেমতন্ন করতে কে কে গিয়েছিল?

পরমবাবু—আমি ছিলাম, আপনার বন্ধু সুরেনবাবু ছিলেন আরও দু'তিনজন।

—গিয়ে কি বললেন?

—বললাম, আজ সন্ধ্যায় বাবাজীর আশ্রমে আপনারা দুটি অন্ন গ্রহণ করে কৃতার্থ করবেন।

—একথা বললেন? কুকুরগুলো কিছু বুঝলো?

পরমবাবু খুব পরিশ্রম করে বোঝাতে লাগলেন—না বললে রক্ষে ছিল। বাবাজী আমাদের আস্ত রাখতেন! কুকুর হয়েছে তো কি হয়েছে? আপনি বিষয়ী মানুষের দৃষ্টি দিয়ে এসব বিষয় বিচার করবেন না।

নেমন্তন্নের আসরের দিকে যাচ্ছি। দেখলাম বাগানের কয়েকটা গাছে বড় বড় বাতি ঝুলিয়ে দিয়ে জায়গাটা আলোকিত করা হয়েছে। সারি সারি আসনপাতা। সামনে কলার পাতায় খিচুড়ি ও মাংস। মাংস ও খিচুড়ির সুগন্ধে বাগান থমথম্ করছে।

চারিদিকে রব উঠলো—এসেছে, এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের নানাদিক থেকে, নানা ঘর ও কক্ষ থেকে উৎসুক দর্শক ও দর্শকা ছুটে আসতে লাগলো। বুঝলাম, নিমন্ত্রিত কুকুরেরা এসে গেছে। পরমবাবু দৌড়লেন। আমি দৌড়তে আর পারলাম না। একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গলা উঁচিয়ে রইলাম।

দেখলাম দৃশ্য। কিন্তু কোথায় কুকুর? সব আসনগুলিই খালি। শুধু একটা রোগাটে চেহারা সাদা রঙের দীনহীন কুকুর আসন থেকে একটু দূরে ভয়ার্ত ও সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে।

এক ভদ্রলোক ভাবে গদগদ হয়ে বললেন—ঐ যে এসেছে। আসতেই হবে। একে একে সবাইকে আসতে হবে।

আবার শুনলাম ফিসফিস করে কে একজন বলছে—কই

পরমদা, কালোগুলোকে এত করে বলা হলো, একটাও এল না কেন ?

ভাবুক ভদ্রলোক আবার যেন ভাবের ঘোরে ঢেঁকুর তুললেন ঘড়ঘড় করে—আসতেই হবে। একে একে সবাইকে আসতে হবে।

রাত্রি নটা বেজে গেছে। আর আধ ঘণ্টা পরে মোটর বাস আসবে। ট্রাঙ্ক রোডের ওপর গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। সুটকেশটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

বিদায় দেবার সময় সুরেনদা কুঞ্জবাবু ও চরণ ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু কোনো কথা তাঁরা বলতে পারলেন না। চরণ ডাক্তারের হাবভাব দেখে বুঝে ফেললাম, তিনিও ভাল করেই টোপ গিলেছেন—বাবাজীর অলৌকিক মহিমা বঁড়শির মত মনের নাড়ীতে গিয়ে বিঁধেছে। শুধু পরমবাবু অনুরোধ করলেন বারবার—আজ রাত্রিটা আপনিও থেকে গেলে পারতেন।

—না। বেশ রূঢ়ভাবেই বললাম।

তবু শুধু পরমবাবুই বিদায় দিতে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। সড়কে পা বাড়িয়ে দিলাম। পরমবাবুকে নিছক ভদ্রতার খাতিরে একটা নমস্কারও জানালাম না। ইচ্ছে করেই করলাম না।

পরমবাবু কিন্তু হাত তুলে নমস্কার করলেন—আচ্ছা, আসছে পূর্ণিমায় অবশ্য আসবেন নিতুবাবু। বাবাজীর ইচ্ছেয় আর একটা উৎসব আছে। বাঘ ভোজন হবে।

গল্পলোক । শুক্লাভিসার

শু ক্লা ভি সা র

কলের চিম্‌নি কলোনি আর চওল নিয়ে বোম্বাইয়ের দাদার। ঘাটি মজুরদের দেখলে মনে হয়, ওরা যেন একটা ছত্রভঙ্গ বিলদার পল্টনের লোক—বেঁটেখাট শক্ত কালো কাজে-ছেঁচা শরীর। ওদেরই পূর্বপুরুষ একদিন মহারাজা শিবাজীর সহায় থেকে রাজ্য ও রাজা ভেঙেছে ও গড়েছে, পেশোয়াদের মুলক্‌গিরি সার্থক করেছে। আজ আবার ওদেরই শ্রমের স্বেদ স্বাতীজলের মত বোম্বাইয়া বেনিয়াদের ভাগ্যের ঝিনুকে মুক্তা ফলিয়ে রাখছে।

ওদের মধ্যে অনেকে দেবল ত্রিপাঠীকে চেনে, মান্য করে, আর গুরুজী বলে ডাকে। শুধু গুরুজী বললেই ওরা সব পরিচয় বুঝে ফেলে। দেবল ত্রিপাঠীর বাড়ি যে দূর জব্বলপুরের কাছে কোনো একটা গাঁয়ে, আর তার বাবা যে একজন সেকেলে জাগীরদার—এত সব কুলমানের খবর তারা রাখে না। ত্রিপাঠীকে আজ প্রায় আড়াই বছর ধরে তারা এই ভাবেই দেখে আসছে; মাথায় বড় বড় চুল, ঢিলে পায়জামা আর গায়ে একটা আঁটসাট চোগা। সুগঠন ফর্সা চেহারার এই নওজোয়ানকে তারা প্রায়ই ঘুরতে দেখে—হাতে একটা ঝোলা, তার মধ্যে বই কাগজপত্র ইস্তাহার ও আরও কত কী যে থাকে কে জানে! মজুর এলাকায় আজ যে এগারটা স্কুল চলছে, তা সবই একা ত্রিপাঠীর কঠিন কায়পাত মেহন্নতের ফল। আরও কত হবে।

রাত বেরাতে হঠাৎ হয়তো নতুন মহল্লার কোনো চওলের আঙিনায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে ত্রিপাঠী। এদিক ওদিক থেকে জোড়া জোড়া

তাড়িকষা লাল চোখের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি জ্বলতে থাকে। আচম্বিতে একটি ঘাটি যুবকের ক্রুদ্ধ মূর্তি পথ রুখে দাঁড়ায়, পেছন থেকে নিঃশব্দে আরও পাঁচসাত জন ঘিরে ধরে। এক আধটা লোহার ডাণ্ডাও হয়তো থাকে কারও হাতে।

ক্রুদ্ধ মূর্তিটা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে প্রশ্ন করে—কুঠে ঘর ?

ত্রিপাঠী অলক্ষ্যে মুচকে হেসে জবাব দেয়—হিন্দুস্তান।

সন্দেহ আরও শানিত হয়ে ওঠে। নাসিক নয়, সুরত নয়, সাতারা পুনা নয়, কাথিয়াবাড় নয়—হিন্দুস্তান ?

আবার প্রশ্ন করে—তোমাচা নাম ?

ত্রিপাঠী উত্তর দেয়—গুরুজী।

গুরুজী। সঙ্গে সঙ্গে সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানায়। কতদিন ধরে তারা আশাপথ চেয়ে আছে, কবে গুরুজী এই দিকে আসবে। এতদিন শুধু নামই শুনে এসেছে তারা। গুরুজী এলেই একটা স্কুল খুলে যাবে, তাছাড়া আরও কত নতুন কথা শোনাবে গুরুজী, অন্য পাড়ায় সবাই শুনেছে। সেই ধুলোর ওপর বসে পড়ে সবাই। হাঁক ডাকে আরও কত লোক চলে আসে।

ত্রিপাঠীর কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। মজুরেরা নতুন কথা শোনে। গুরুজীর কথাগুলির পেছনে যেন এক সুদিনের সূর্য কিরণজাল গুটিয়ে স্থির হয়ে রয়েছে। গুরুজীর কথামত সাহসে ও প্রতিজ্ঞায় একবার দল বেঁধে উঠে দাঁড়ালেই যেন সেই সূর্য দেখা যাবে। কিন্তু সব কাজের আগে একটা স্কুল খুলে যায়। সবাই শিখবে—বাপ ছেলে নাতি কেউ বাদ যাবে না।

বরুত্রীর সঙ্গে দেবল ত্রিপাঠীর দেখা হয়েছিল আকস্মিক ভাবে। জানকী বাই ধর্মশালার একটি কুঠুরীর চৌকাঠের ওপর বসে একা একা কাঁদছিল বরুত্রী। একে বাংলা দেশের বিধবা, তায় বয়স অল্প,

তায় বিদেশ। দেশে তিন কুলের কোনো সংসারে দুটো সম্মানের ভাত কপালে জোটে নি বলেই একটা অনির্দেশ্য ভরসায় ঝাঁপ দিয়ে চলে এসেছে দূর বোম্বাই শহরে—চাকরী পাবে বলে।

ত্রিপাঠীর মত চলতি-হাওয়ার পন্থী যারা, ধর্মশালা তাদের কাছে একটা ঝড়ের রাতের আশ্রয়। ত্রিপাঠী সেদিন ধর্মশালাতেই ছিল। বরুত্রীর কাণ্ড দেখে জিজ্ঞেস করলো—কাঁদছেন কেন?

বরুত্রী—চাকরী খুঁজতে এসেছিলাম, কিন্তু দেখছি চাকরী পাওয়া যাবে না।

ত্রিপাঠী হেসে ফেললো—চাকরীর জন্য কান্না? আচ্ছা, কালই আপনাকে চাকরী জুটিয়ে দেব।

ঠিক পরের দিনই এসে ত্রিপাঠী বরুত্রীকে ধর্মশালা থেকে নিয়ে গেল। শেঠ গোকুলদাস ফণ্ডের কর্তাদের ধরাধরি করে প্যারেলে একটা হরিজন মেয়েদের স্কুল খোলাবার ব্যবস্থা করে ফেললো ত্রিপাঠী —এক রাত্রির মধ্যেই। বরুত্রী কাজ পেয়ে গেল—হরিজন মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

ত্রিপাঠী বলে গেল—এখন শুধু হাইজিন, সেলাই আর ড্রিল শেখাবেন। হিন্দিটা আগে ভাল করে শিখে নিন আমার কাছে, আর সামান্য একটু মারাঠি। মাত্র তিনটি মাস প্রতিদিন একঘণ্টা করে আমি আপনাকে হিন্দী শেখাবার জন্য সময় নষ্ট করবো। এর বেশি আর এক ঘণ্টাও নয়!

ত্রিপাঠীকে শেষাশেষি বরুত্রীরও গুরুজী হতে হলো। এই তিন মাসের মধ্যে বরুত্রী ত্রিপাঠীকে একরকম চিনেছে। এটা ঠিক দাদারের মজুরদের মতন করে চেনা নয়। এমন একজন স্বার্থহীন হিতব্রত কর্মীর ওপর শ্রদ্ধা না এসে পারে না; বরুত্রী ত্রিপাঠীকে শ্রদ্ধা করে। অচেনা জনতার মাঝখানে একটা দরদী হৃদয়ের সান্নিধ্য এত সুলভ হলে কে

না অন্তরঙ্গ হতে চায়? তাই বরুত্রী তার অন্তরের অঙ্গনে এক প্রীতমের আওন-কি-আওয়াজ যেন শুনতে পায়। একটি সুন্দর মুখের টানে তার চোখের চাহনী লজ্জায় বিপন্ন হতে থাকে। কিন্তু এই পর্যন্ত।

একটা পশমী কাপড়ের টুপির ওপর লাল সুতো দিয়ে জোড়া-হরিণের নক্সা তুলে রেখেছিল বরুত্রী। তিনমাসের শেষে শেষ-পড়ার দিন বরুত্রী সাহস করে ত্রিপাঠীকে উপহারটা দিয়েই ফেললো। বরুত্রীর মনে যাই থাক, মুখে বললো—গুরুদক্ষিণা দিলাম।

কিন্তু উপহারটা শুধু মাথায় উঠেই রইল বোধ হয়। ত্রিপাঠীর মনের ভেতর পৌঁছয় নি। পৌঁছলে তার সাড়া ফুটে উঠতো নিশ্চয়—মুখের ভাবে একটু রক্তাভ বিড়ম্বনার ছায়া, একটু সলজ্জ হাসি। কিন্তু কই? টুপিটা মাথায় দিয়ে ত্রিপাঠী শুধু বললো—বাঃ বেশ জিনিসটি!

বিদায় নেবার সময় ত্রিপাঠী বলে গেল—এইবার তুমি নিজেই নিজেকে ট্রেনিং দাও বরুত্রী। প্রথমে ভুলে যাও যে তুমি শুধু চাকরী করছো। যে কাজ নিলে তাকে ভালবাসতে শেখ। তাহলেই এর মধ্যে তুমি জীবন খুঁজে পাবে, নইলে চিরকাল একাজ তোমার কাছে মাত্র একটা জীবিকা হয়েই থাকবে।

ত্রিপাঠীর কথায় বরুত্রীর মেয়েলী প্রত্যয়ে হঠাৎ একটা রূঢ় আঘাত লাগে। বাঙালী মেয়ের মনের আলপনার রং সাতশো মাইল দূরের মহাকোশলের একটি ছেলের চোখে ধরা পড়ে গেছে কত সহজে। কিন্তু কেজো জীবনে এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। তাই বোধ হয়

যথা নিযুক্তোঽস্মি। স্কুলটাই সর্বস্ব হয়ে উঠলো বরুত্রীর। যত অভাগার ঠাঁই থেকে কতগুলি নোংরা মহরের মেয়ে কুড়িয়ে এনে

স্কুল গড়া হয়েছে। এদেরই লেখাপড়া শেখাতে হবে। বাঁধাকাজের একঘেয়ে রুক্ষতা, হেলাফেলা দিনযাপনের গ্লানি মুছে গেল বরুত্রীর। এক দিব্য তৃপ্তির আস্বাদে কাজের মুহূর্তগুলি মিষ্টি হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট মহরের মেয়েগুলি, এরই মধ্যে সুর মিলিয়ে 'জন-গণ-মন' গাইতে শিখেছে। কত বাধ্য! ঠিক নিয়মমত সপ্তাহে শনি-মঙ্গল ফ্রকগুলি কেচে নিতে ভুল করে না। সেদিন সেই একেবারে অপোগণ্ড ভাঙ্গি মেয়েটা বরুত্রীর ধমক খেয়ে যেভাবে অভিমানে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো, বরুত্রী আর চুপ করে থাকতে পারলো না। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মেয়েটাকে কোলের ওপর তুলে জড়িয়ে ধরলো। প্রসূতি মাতার পুলকের মত এক অভিনব বাৎসল্যে বরুত্রীর দেহমন শিউরে ওঠে। এক শিশু মহাজাতির স্পর্শে তার চেতনার সকল ক্ষুদ্রত্বের বদ্ধদুয়ার খুলে যায়—ঘরে যেন নতুন আলো আসে।

ত্রিপাঠীর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। গল্পে আর কাজের কথায় দুজনের মন উৎসাহে অস্থির হতে থাকে। বরুত্রীর মনে পড়ে যায়, সেই টুপি উপহার দেবার প্রগলভতা। তার মধ্যে যেন ঘুষ দেবার মত একটা দীনতা ছিল। ত্রিপাঠীকে কত সস্তা চরিত্রের লোক মনে করেছিল বরুত্রী। কী মতিচ্ছন্নতা হয়েছিল তার!

কিন্তু তবুও, আর একটু পরেই ত্রিপাঠী চলে যাবে। বড় একা ও ফাঁকা মনে হবে। বরুত্রীর সকল ভাবনা এক বিষণ্ণ তন্দ্রার মত বাকী অবসরটুকু অর্থহীন করে দেয়।

এক-একদিন ত্রিপাঠী এসে বরুত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যায়। মহালছ্মীর তালের সারির ছায়ায় শুক্লা সন্ধ্যায় বালিয়াড়ীর ওপর দুজন হেঁটে ফিরতে থাকে। বরুত্রীর মনে হয়, অস্থির জীবনের নক্ষত্রলোকে মাত্র এক সঙ্কল্পের ছায়াপথে তারা দুজনে যেন পাশাপাশি চলেছে। জাতি কুল ভাষা পরিচ্ছদ প্রদেশ—সব ভেদ যেন এখানে খারিজ হয়ে

গেছে। এখানে আপনা হতেই হাতে বরমাল্য উঠে আসে। সকল কুলজী বিচার এখানে মিথ্যে হয়ে যায়।

বরুত্রী বলে—আমাকে তোমার সঙ্গে সঙ্গে রাখ দেবল। আরও কাজ দাও আমাকে। তুমি একা কত কাজ করছো, আমি কিছুই জানতে পারি না। কিছুই বল না আমাকে।

ত্রিপাঠী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে—আর একটু ভেবে বলো বরুত্রী। এত তাড়াতাড়ি ওকথা বলতে নেই। ভুল হতে পারে।

বরুত্রী ত্রিপাঠীকে ভালবেসে ফেলেছে ; অস্বীকার করলে মিথ্যা হয়। সঙ্কল্প—এ যুগের নরনারীর মিলনে প্রণয়ে এই এক নতুন রাখী। সঙ্কল্পে যারা এক হতে পেরেছে, জীবনে তাদের এক হয়ে যেতে দোষ কি ?

তবু মনে হয়, এই রাখীর সূত্রে কোথায় যেন একটু পাক আলগা হয়ে রয়েছে। তাই টানে জোর হয় না। বরুত্রী বুঝতে পারে, একে ঠিক পাশাপাশি চলা বলে না। ত্রিপাঠী চলেছে আগে আগে, বরুত্রী তার পেছনে। মাঝে বেশ খানিকটা মহত্ত্বের ব্যবধান। বড় বেশি তীক্ষ্ণ উদার উঁচু-মাথার মহত্ত্ব। তিল মাত্র হৃদয়ের তাপ নেই।

একটি বছরও পার হয় নি ; পুষ্কর মিত্রকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—বরুত্রীর সঙ্গে মহরপাড়া আর ভাঙ্গিদের বস্তিতে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ায়। পুষ্কর বলে—আমার বাপ বড়লোক, কিন্তু আমি ছোটলোক। আমিও আমার ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেছি বরুত্রী। আমিও একটা হরিজন স্কুল খুলবো।

পুষ্করের কথার ভঙ্গীতে একটু বেশি উচ্ছ্বাস থাকলেও, বরুত্রী ওর আন্তরিকতাটুকু সন্দেহ করে না। খুশি হয়। স্টীভেডার মিত্র এগু

কোম্পানীর মালিক শ্রীকান্ত মিত্রের একমাত্র ছেলে পুষ্কর। জুহুতে এক পাহাড়ী টিপির ওপর পালেৎসা ঢঙে এমন একখানা বাড়ি; তবু এই প্রচণ্ড বনেদী বিত্তের ছলনা পুষ্করকে আটকে রাখতে পারে নি। সে নিজেই বলে—এটা ঠিক জেন বরুত্রী, ঘরে বসে বাপের দৌলত ফুঁকে জীবনটা পার করে দেব, সে-পাত্র আমি নই। তার চেয়ে একবেলা ছুটো বাজ্‌রার রুটি চিবিয়ে দেশের দশটি গরীবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে থাকবো। আমি তোমারই মত সেবার ব্রতে নেমে আসতে চাই।

বরুত্রী হেসে ফেলে—নেমে আসতে চাই? সে কি? বল, উঠে আসতে চাই।

পুষ্কর এরকম ব্যাকরণের ভুল ধরলেই গেছি। তোমাদের কাজ করতে গিয়ে কোথায় কবে পান থেকে চুনটি খসবে, আর তোমরা সবাই তখন ··

বরুত্রী—তোমাদের কাজে, মানে? বল, আমাদের কাজ।

পুষ্কর মুখ কাঁচুমাচু করে বলে—আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে বরুত্রী, আরও হয়তো হবে। তুমি শুধরে নিও।

পুষ্করের এই ধরনের কথাতেই বেশি বিচলিত হয়ে পড়ে বরুত্রী। অবুঝ আতুরে ছেলের যেমন পাত্রাপাত্র জ্ঞান নেই; হঠাৎ বায়না ধরে বসে; পুষ্করের কথাগুলি সেই ধরনের। কথায় কথায় সে নিজেকে বরুত্রীর সদিচ্ছার ওপর সঁপে দিতে চায়। বরুত্রীর চিত্ত ঘিরে একটা যে সতর্ক বেড়ার আঁটুনি আছে, তার মধ্যেও কোথাও দুর্বলতার ফাঁক আছে নিশ্চয়। নইলে পুষ্কর বরুত্রীর কাছে এতটা প্রশ্রয় কখনই পেত না।

ভোর রাত্রে উঠে এক-একদিন পুষ্কর আর বরুত্রী বস্তির পোয়াতি মেয়ে আর শিশুদের স্বাস্থ্যের রিপোর্ট নিতে বার হয়। পথে যেতে দেখা যায়, মহাজনদের দালানের অলিন্দের নীচে কয়েকটা বুড়ো-হাবড়া

মুটে আর ভিখিরী ছেলেমেয়ে উবু হয়ে বসে পথের ধুলো হাতড়াচ্ছে। পোষা পায়রার উচ্ছিষ্ট ছোলার দানা খুঁজছে তারা। পুষ্করের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে—তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর বরুত্রী, এই সব দুঃখ দূর করা সম্ভব? এ কী চারটিখানি কথা? দুচারটে স্কুল করে লেখাপড়া শেখালেই যে কী হাতীঘোড়া লাভ হবে বুঝি না।

ফেরবার পথে ট্রাম থেকে নেমে বাইকুলা পুল ছাড়িয়ে একটা মুচিদের বস্তির ভেতর ঢোকে বরুত্রী। পুষ্করের মনের প্রসন্নতার ওপর চকিতে একটা ফাঁড়া ঘনিয়ে আসে। রুমাল বার করে বার বার নাক মোছে—ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকায়।

বস্তি থেকে যখন দুজনে বের হয়ে আসে, তখন মাথার ওপর রোদ চন্‌চন্‌ করে। পুষ্কর এইবার বরুত্রীকে অনুরোধ না করে আর পারে না—একটা কাফেতে ঢুকে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলে ভাল হতো না কি বরুত্রী? না হয়, সামনের ঐ হিন্দু বিশ্রান্তি গৃহেই গিয়ে বসি; একটু সামান্য সরবৎ টরবৎ···

বরুত্রী হেসে ফেলে আর অনুযোগ করে—ওসব বদভ্যাস ছাড় এবার।

বরুত্রীর স্কুলঘরেই সেদিন পুষ্কর বসে গল্প করছিল। ঘরে ঢুকলো ত্রিপাঠী।

—এটা আবার কে রে বাবা? পুষ্কর কথাটা উচ্চারণ করেই বরুত্রীর দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে রইল। বরুত্রীর দৃষ্টিতে ভৎ‌সনার খরবিদ্যুৎ যেন পুষ্করকে সাবধান করে দিল। বাচালতা সংযত করে নিলে পুষ্কর।

ত্রিপাঠীর সঙ্গে পুষ্করের আলাপ আলোচনা হলো অনেকক্ষণ। এই প্রসঙ্গমুখর সময়টুকুর মধ্যেই বার বার পুষ্করের মনস্কতা ভেঙ্গে

যাচ্ছিল। ত্রিপাঠীর সম্পর্কে বরুত্রীর আচরণ—দুর্ভেদ্য হেঁয়ালির মত হতবুদ্ধি করে দিচ্ছিল তাকে। ত্রিপাঠী চলে গেলে পুষ্কর সোজাসুজি কথাটা না বলে আর পারলো না—তুমি যে ত্রিপাঠীর কাছে কৃতজ্ঞতায় একেবারে বাঁধা পড়ে গেছ বরুত্রী। এই সামান্য চাকরীটার জন্যেই তো ?

বরুত্রী—বড় খারাপ ভাবে কথাগুলি বলছো পুষ্কর। এরকম বলো না।

পুষ্কর চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। বরুত্রী দেখলো, পুষ্করের দুচোখের কোণ সজল হয়ে উঠেছে। মুখটা হৃতাশ্রয় মানুষের মত বেদনায় করুণ।

—এ-কী ? ছি, ছি, আমাকে এভাবে বিপদে ফেল না পুষ্কর। বরুত্রী একটা অস্বস্তিতে ছটফট করে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। পুষ্করের হাতটা ধরে জোর করে বসিয়ে দেয় ; শেষে অভিভাবিকার মত স্পর্দ্ধিত শাসনের সুরে বরুত্রী যেন ধমক দিয়ে ওঠে—এখন যেতে পাবে না। অবাধ্য হয়ো না। বসো।

পুষ্করের বুদ্ধিতে কোন্ রন্ধ্রে যেন এক শনি ঢুকেছে। কোথা থেকে এক প্রচণ্ড বাঙালিয়ানার দর্প এসে পুষ্করের মেজাজ ঝলসে দিয়েছে। সে বলে—পলিটিক্সে আর কাল্চারে আমি আগে বাঙালী, পরে অন্য কিছু। তুমিও তাই বরুত্রী, তবু মুখে সেটা মানতে চাও না।

কখনও বলে—ত্রিপাঠীর মধ্যে কেমন একটা কাটখোট্টাই ভাব আছে। নয় কি বরুত্রী ?

বরুত্রীর অন্তরাত্মা যেন একটা অশুচি হাতের ধাক্কা খেয়ে চমকে

ওঠে। পুষ্কর তবু বলে যায়—শত হোক, ওদের সঙ্গে শুধু কথাই বলা যায়। মেলামেশা যায় না।

পুষ্করের সর্বশেষ অনুরোধ—তুমি বেঙ্গলে ফিরে চল বরুত্রী। সেখানে অজস্র হরিজন পাওয়া যাবে। আমাদের কাজের কোনো অভাব হবে না।

বরুত্রীর মনের ভেতর প্রতিবাদ আর আত্মগ্লানির ঝড় উদ্বেল হয়ে উঠতে থাকে। পুষ্কর তার নিরর্গল মনের সাধ অকপট ভাবে বলে যায়। পশুপক্ষীর প্রকৃতির মত মানুষ পুষ্করের এই মন্দাহিংসা ভয়ঙ্কর কুৎসিত লাগে বরুত্রীর। বরুত্রীর স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে শুনতে পায়, পুষ্কর বলেই চলেছে—তোমার হাতেই আমি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। শুধু একটি প্রতিশ্রুতি দিও বরুত্রী; তোমাকে আপন করে নেবার মত যোগ্যতা যেন আমি পাই। যেদিন পাব, সেদিন তুমি দূরে সরে থাকতে পারবে না।

চমকে ওঠে বরুত্রী। দুর্বলতা চরম হয়ে ওঠে। পুষ্কর যেন জোর করে তার জায়গা করে নিচ্ছে। পুষ্করের আত্মনিবেদনের দুঃসাহস ঠেকিয়ে রাখার মত শক্তি কুলিয়ে উঠতে পারে না বরুত্রী। আর স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে বাকী নেই—পুষ্কর কি চায়? পুষ্করের এই হরিজন সেবার উৎসাহ এক কপট তপস্যা মাত্র। মনের দিক থেকে তার অনুমাত্র তাগিদ নেই—তবু ভালবাসার দায়ে আগুন ছুঁয়েছে পুষ্কর।

পুষ্করের বাঙালিয়ানা। ভুভারতের পথের ভিড় থেকে সঙ্গহারা করে সে বরুত্রীকে এই নেপথ্যে নিয়ে যেতে চায়। ভীরু মাকড়সার মত পুষ্কর যেন এক কোণে জাল পেতে বসে আছে। সেখানে বরুত্রীকে একবার যদি পাওয়া যায়, অমনি তাকে আপন বৃত্তের মধ্যে লুফে নেবে পুষ্কর।

বাপের দৌলত। এই রূপোর পাহাড়ের ওপর বসে থাকলে বরুত্রী দূরেই সরে থাকবে। এমন দৌলতে কোনো প্রয়োজন নেই পুষ্করের। সব বঞ্চনা নিন্দা ত্যাগ ও ক্লেশের কাটাভরা পথের সর্ত সে মেনে নিয়েছে। সে পৌঁছতে চায় বরুত্রীর কাছে। বরুত্রীই ওর কাছে একমাত্র সত্য।

ভাবতে গিয়ে, নতুন এক প্রত্যয়ের মদিরতা বরুত্রীর সকল বিচার আচ্ছন্ন করে ফেলে। আগে ভালবাসতে হয়---তবেই সঙ্কল্পে সমান হওয়া যায়। মিলনেই সব সহজ হয়ে যায়। ভিন্নপথের ধাঁধাঁ ঘুচে যায়। পুষ্কর তাই এগিয়ে আসছে। না এসে উপায় নেই। ভালবাসা ঠিক থাকলে, এক ব্রতে তাদের মিলতেই হবে। এ রাখীর কোনো সুতো আলগা রাখে নি পুষ্কর। শত কামনার গিঁট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। আপনা থেকেই গলায় তুলে নিতে ইচ্ছে করে।

পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বরুত্রীর বড় বড় চোখ দুটি আবেশে ভাসতে থাকে। কয়েকটি মুহূর্ত যেন মনের শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বরুত্রীর মাথাটা পুষ্করের কাঁধের কাছে ঝুঁকে থাকে। খোঁপা থেকে কাঁটাগুলি এক এক করে খুলে নামিয়ে রাখতে থাকে পুষ্কর। ভারনম্র তরুশাখা থেকে পুষ্কর যেন এক একটি ফুল তুলছে।

বরুত্রী হঠাৎ একটা ঠেলা দিয়ে ধড়ফড় করে ওঠে—দূরে সরে গিয়ে বসে—অত্যাচার করো না পুষ্কর। আজকের মত দয়া করে একটু বাইরে যাও। এখানে থেক না।

দেবল ত্রিপাঠী এসে বললো—কিছুদিনের মত বাইরে চলে যাচ্ছি বলেই দেখা করতে এলাম। একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না। পুষ্কর মিত্র ভালোমানুষ সন্দেহ নেই, কিন্তু সে একজন এডভেঞ্চারার মাত্র। আমার ভয় হয়, তুমি ভুল করছো বরুত্রী।

বরুত্রী চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে—হ্যাঁ, আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু তুমি স্বয়ং কি? শত নিরীহতায় তুমি অপরাধী। তুমি সোনার গাছ—নিষ্ফল শুচিতায় শুধু স্থির হয়ে আছো। তোমার ছায়া হয় না। তুমি শুধু বুদ্ধিমান। তুমি হৃদয়ের দাম বুঝবে না কোনদিন। মনের প্রতিবাদ চাপতে গিয়ে বরুত্রীর দৃষ্টি আনত হয়ে আসে।

ত্রিপাঠী বললো—ফিরে এসে হয়তো দেখবো, তোমরা দুজনে বিবাহিত জীবনে সুখী হয়ে রয়েছ। ভালই হবে। আমারও তাই ইচ্ছে। তবে স্কুলটা যেন ঠিক থাকে বরুত্রী।

একথা বলতে ত্রিপাঠীর গলার স্বর একবার কেঁপেও উঠলো না। গুরুজীর আসনে বসে ত্রিপাঠী তাকে আজ বেশ একটু হীন করে দেখছে—স্কুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা করছে। যাক, এই ভুলের আবরণ ঘুচাতে কতক্ষণ? বরুত্রী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে—ত্রিপাঠী ফিরে এসেই দেখবে স্কুলের কতটা উন্নতি হয়েছে। আরও দেখবে, এক দুর্বাধ্য এডভেঞ্চারারকে বশ করে সে কিভাবে তাকে জাতিসেবার ব্রতে দীক্ষিত করে নিয়েছে। ত্রিপাঠী বুঝবে—গুরুজীদেরও ভুল হতে পারে। আরও বুঝবে, পৃথিবীর বরুত্রীরা ভুয়ো নয়।

ত্রিপাঠীকে বিদায় দিতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল বরুত্রী। সামনের গলিটা বড় অন্ধকার। একটা কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে দরজার কাছে রাখলো। ত্রিপাঠী পথে পা দিতে, বরুত্রী আঁচলসুদ্ধ হাত দুটো তুলে কপালে ঠেকালো—নমস্তে।

স্পষ্ট উচ্চারিত হলো না। বরুত্রীর মাথাটা অলস ভাবে জোড়-হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে রইল কিছুক্ষণ।

ত্রিপাঠী চলে গেছে। বরুত্রীর কাজের প্রেরণা তবু প্রদীপের মত

জ্বলতে থাকে। কোনো ফাঁকি, কোনো শৈথিল্য, কোনো অবসাদ তিলেকের জন্য তাকে বিভ্রান্ত করে না।

এক নিরাতঙ্ক আনন্দে মজে ছিল পুষ্কর। মনে মনে হাঁপ ছাড়ে, বর্গীর উপদ্রব যেন শান্ত হলো এতদিনে। সারা বাংলার পৌরুষকে অপমান করার জন্যই যেন ত্রিপাঠী তৈরী হয়েছিল। একজাতি আর মহাজাতি! ওসব ফাঁকা বুলি কংগ্রেসের বৈঠকী প্রস্তাবেই ভাল শোনায়।

পুষ্কর আর বরুত্রীর বিয়ে এখনও হয় নি। যে কোনো দিন হয়ে যেতে পারে। বেঙ্গল ক্লাবের গল্পগুজব ছ'মাস ধরে এই প্রসঙ্গের গন্ধে ও আমোদে ভন্‌ভন্‌ করছে—হরিজন মেয়েস্কুলের এক বিধবা মাস্টারণীর পাল্লায় পড়েছে টাকার কুমীর শ্রীকান্ত মিত্রের একমাত্র ছেলে পুষ্কর। শ্রীকান্ত মিত্রও শক্ত লোক। স্পষ্ট ভাষায় প্রতিজ্ঞা শুনিয়ে দিয়েছেন, যদি এই বিয়ে হয়, তাহলে পুষ্কর মিত্রকে একটি কাণাকড়িও ছুঁতে হবে না। ফুলের টবগুলি পর্যন্ত দানখয়রাতের জন্য লিখে দিয়ে যাবেন।

পুষ্কর মিত্র ঘাবড়ে যাবার ছেলে নয়। সে নিজেই নিজের পথ করে নিতে জানে এবং করেও নিয়েছে। সে-কথাই জানাবার জন্য সেদিন বৈকালে স্কুল ঘরে আচম্বিতে এসে বরুত্রীর কাজে বাধা দিল—ওসব ঠেলে সরিয়ে রাখ এখন। বাইরে ঘুরে আসি চল। অনেক কথা আছে।

বিরক্তি ও অনিচ্ছা চেপে রেখে বরুত্রীকে যেতে হলো পুষ্করের সঙ্গে। পথে তিনবার ট্রাম-বাস বদল করে মেবিন লাইন পৌঁছানো পর্যন্ত বরুত্রী একটা সংশয় নিয়ে পুষ্করের হাবভাব আচরণ লক্ষ্য করলো। কোথায় যেন তালভঙ্গ হয়েছে মনে হচ্ছে। অন্যদিনের তুলনায় বেশ একটু বিসদৃশ।

মেরিন লাইনের নতুন পোস্তার ওপর দুজনে পাশাপাশি বসে রইল অনেকক্ষণ। পেছনে পিচ্ছিল পিচের নদীর মত কুইন্‌স্‌ রোড ছাপিয়ে দলে দলে লোক বেড়াতে আসছে। সূর্য ডুবছে, কাদাটে আরব সমুদ্রের জলে গুলালী আলোকের চূর্ণ ছড়িয়ে পড়েছে। এক পার্শী ঠাকুর্দা নাতিনাতনীর সঙ্গে ভেজা বালি দিয়ে একটা নকল গেট-অব-ইণ্ডিয়া তৈরী করে হাসছে খেলছে। অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতেই তারা চলে গেল। দূরে রাতের মালাবার হিল—আকাশ থেকে যেন একটা দীপান্বিতা মেঘপুরী সমুদ্রের জলের ওপর ঝুলছে।

পুষ্কর বললো—যে কাজটা পেয়েছি, তাতে আমিই প্রথম বাঙালী। প্রথম ইণ্ডিয়ানও বলতে পার। কোনো মেড়োকে আজ পর্যন্ত এই পোস্ট দেওয়া হয় নি।

গায়ে আধময়লা খদ্দরের শাড়ি, পায়ে নিজের হাতে তৈরী এক জোড়া রঙীন বেতের স্যাণ্ডেল—তাও ছিঁড়ে গেছে। প্রকাণ্ড রুক্ষ খোঁপাটা ভেঙে ঘাড়ের ওপর হেলে পড়েছে। বরুত্রী নিষ্কম্প দৃষ্টি তুলে তার পাশের প্রসন্নভাগ্য এই পুরুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পুষ্কর বললো—ভারতবর্ষে এই প্রথম একটি আসমানী ফৌজ তৈরী হলো। এক বছর প্রোবেশনার হয়ে কাজ করবো, তার পরেই অফিসার করে দেবে। যতদিন না পারমানেণ্ট হই বরুত্রী, ততদিন তোমাকে একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। তারপরই তোমায় এসে নিয়ে যাব।

বরুত্রীর সকল বোধ বিচার আর অনুভবের স্নায়ুজাল যেন নিদারুণ এক অর্থহীনতায় ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছিল।

বরুত্রী—নিয়ে যাবে? কোথায়?

পুষ্কর—আলমোড়া। ছোট একটি বাংলো ভাড়া করবো সেইখানে তুমিই গিয়ে আমার সংসার সাজিয়ে বসবে।

বরুত্রীর সম্বিৎ যেন অনড় পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে যায়। পুষ্কর উৎসাহিত হয়ে বলে—তোমার ভাগ্যের জোরেই এত ভাল কাজটা পেয়ে গেলাম। এইবার তোমার ঐ নোংরা চাকরীর দুঃখ দূর হবে। শুনে তুমি খুশি হচ্ছ না বরুত্রী?

বরুত্রী তার মাথার জ্বালা দূর করার জন্যই বোধ হয় একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো। মনের ভেতর একটা চরম ব্যর্থতার জ্বালার হলকা ছুটছিল। বরুত্রী বললো—বুঝেছি, তুমি সেপাই হতে চলেছ। এতদিনে মনের মত আদর্শ খুঁজে পেয়েছ।

পুষ্কর—তুমি রাগ করছো। মস্ত ভুল করছো বরুত্রী। আর দুটি মাস মাত্র এখানে আছি। আর্যসমাজের শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক করে এসেছি।

বরুত্রী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিল। মেরিন লাইন স্টেশনে একটা লোকাল ট্রেন আসবার সিগন্যাল পড়েছে। বরুত্রী খোঁপাটা এঁটে নিয়ে তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে গেল। পুষ্কর একা বসে রইল অনেকক্ষণ। কী রকম একটা বিশ্বাস ছিল, বরুত্রী একটু শান্ত হয়েই আবার ফিরে আসবে। এসেই আবার ডাকবে। এর আগে কতবার তো এমনি করে ডেকেছে।

কঠিন ধৈর্যে দিন গুনে গুনে দুটো মাস প্রায় শেষ হতে চললো। পুষ্কর এসে বললো—আমার সময় হয়ে এল বরুত্রী।

বরুত্রী—তুমি যেতে পাবে না।

পুষ্কর—কেন?

—তোমাকে হরিজন স্কুলে কাজ করতে হবে।

—আমি বলছি, তোমাকে স্কুল ছাড়তে হবে।

—অসম্ভব। আমার জীবনের একটা তৃপ্তি আমি মিথ্যে করে

দিতে পারি না। স্কুলের মেয়েদের ছাড়া পৃথিবীর কোনো আলমোড়ার বাংলো আমার ভলো লাগবে না।

—চিনতে পারলাম তোমাকে। আমি এবার বিদায় হই।

—ভুলে যাচ্ছ পুষ্কর, তোমার চলে যাবার অধিকার নেই। আমার ওপর যে নতুন একটি শিশুর প্রাণের দায় দিয়ে গেলে—সে যখন আসবে, তার ভার নেবে কে ?

—ভয় দেখিও না বরুত্রী। তুমিই তো তাকে তোমার হরিঘোষের গোয়ালের একটা পশু করে রাখতে চাও। আমি চাইছিলাম তাকে মানুষের ঘরে তুলে নিয়ে যেতে।

পুষ্কর তার সকল ব্যর্থ আগ্রহের জ্বালা সম্বরণ করে শেষে মিনতি জানালো—তুমি এসব ছেড়ে আমার সঙ্গে চলে এস, বোকামি করো না, বরুত্রী লক্ষ্মী…

বরুত্রী বললো—না, পারবো না।

পুষ্কর—আচ্ছা, যাই।

জামিনে ছাড়া পেয়ে য়েরোড়া জেলহাজত থেকে একবার বোম্বাই আসতে হলো ত্রিপাঠীকে। স্কুল ঘরের টিনের দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলো—বরুত্রী!

সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলো—পুষ্করবাবু।

দরজা খুলে গেল। ত্রিপাঠী হাসিখুশির ফোয়ারার মত ঘরে ঢুকেই বরুত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো—কী সৌভাগ্যবতী? কী খবর তোমাদের বল। পুষ্করবাবু কোথায়?

বরুত্রী—আলমোড়া গিয়েছেন। ভাল সরকারী চাকরী পেয়েছেন।

ত্রিপাঠীর চোখে পড়লো, বরুত্রীর চোখ মুখ ফোলা ফোলা। গলার

স্বর ভাঙা ভাঙা। একটা কান্নার বর্ষা যেন শরীরের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেছে। ছেলে মানুষের মত একটা দুরন্ত কৌতূহল আর দরদ নিয়ে ত্রিপাঠী বরুত্রীর কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো—সব খুলে বল বরুত্রী। কিছু লুকোতে পারবে না আমার কাছে। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

বরুত্রী সব দ্বিধা সঙ্কোচ দূরে ঠেলে ফেলে প্রস্তুত হয়ে নেয়। আজ যেন তার মানত শেষ হবার দিন। বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সব প্রমাদ পতনের স্বীকৃতি শুনিয়ে যাবে।

কাহিনী শেষ করতে বরুত্রীর মাত্র দশটি মিনিট সময় লাগলো। ত্রিপাঠীর মুগ্ধ মুখের দীপ্তি ধীরে ধীরে রঙীন হয়ে উঠতে লাগলো।

বরুত্রী বললো—পুষ্কর আমার মনের একটি সত্যি কথা জানতে পারলো না—তাকে আমি আজ শ্রদ্ধা করি। সে সাহসী ও শক্ত মানুষ; তার আদর্শে সে ঠিক আছে। আমিই তাকে ভুল বুঝেছিলাম।

ছোট ছোট নিরভিমান ঢেউয়ের মত বরুত্রীর কথাগুলি যেন একটি সমাপ্তির কিনারায় এসে ভেঙে পড়ছে। ত্রিপাঠী চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাকিয়ে রইল বরুত্রীর মুখের দিকে। পাথর ছড়ানো কাজের পথে এতদিনে যেন একটি স্ফটিক আবিষ্কার করেছে ত্রিপাঠী। দুরন্ত লোভীর মত দৃষ্টিটা চক্‌চক্ করছিল ত্রিপাঠীর।

বরুত্রী—যাবার আগে গুরুনিন্দা আর করবো না, তাই আর একটি কথা আমার বলা হলো না। শুধু অপেক্ষায় ছিলাম, এইবার আমাকে বিদায় দেবার ব্যবস্থা করুন। স্কুলের জন্য অন্য লোক দেখুন।

ত্রিপাঠী—কেন?

বরুত্রী—বলেছি তো, আমার জীবনে দুর্নামের দাগ লেগেছে। স্কুলের সম্মান আগে বাঁচাতে হবে।

ত্রিপাঠী—হ্যাঁ, বাঁচাতে হবে। আমি আর তুমি দুজনে মিলে বাঁচাবো।

বরুত্রী—দুজনে মিলে?

ত্রিপাঠী—হ্যাঁ গো সাহেবা। আমি মহাপুরুষ নই। আমি কাজের মানুষ। দুজনে মিলে কাজ করতে জানি।

উতলা আকাঙ্ক্ষার দুটি পুরুষবাহু বরুত্রীকে চকিতে বুকের উপর টেনে নিয়ে সাপটে ধরলো। বরুত্রী যেন আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠলো—এ কী করছো, দেবল?

ত্রিপাঠী—তোমাদের দুজনকে চুমো খাচ্ছি।

হেঁয়ালির মত শোনালো। বরুত্রী জিজ্ঞেসা করলো দুজনকে? তার মানে? শীগ্‌গির বল দেবল; আমার ভয় করছে।

ত্রিপাঠী—হাঁ, দুজনকে, তোমাকে আর…

বরুত্রী—আর কাকে?

ত্রিপাঠী—আমার ছেলেকে।

কা লা গু রু

কত মহকুমা অফিসার এল আর গেল, কিন্তু মিস্টার টেনব্রুকের মত কেউ নয়। ছোট শহর সেখপুরার হৃদয় তিনি প্রায় জয় করে বসেছেন। একা উদ্যোগী হয়ে, চাঁদা তুলে আর গ্র্যান্ট বাগিয়ে হাসপাতালটাকে তিনিই মন্দদশা থেকে উদ্ধার করেছেন। পদগৌরবে তিনি মহীরুহ সমান, কিন্তু ব্যবহারে তৃণাদপি সুনীচ। অতি অমায়িক মিশুক প্রকৃতির লোক। আজ সন্ধ্যায় তাঁকে দেখা যায়, দর্জিপাড়ার মিলাদে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশে আছেন; কাল সন্ধ্যায় হরিসভার প্রাঙ্গণে। জুতো জোড়া দরজার বাইরে খুলে রেখে আসতে কখনো ভুল করেন না। কোনো মতেই তাঁর নিষ্ঠার খুঁত ধরা যায় না।

মিস্টার জেরোম টি এল টেনব্রুক ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একটি নতুন নক্ষত্র। আর আলোটাও একেবারে নতুন ধরনের। তাছাড়া তিনি একজন ইণ্ডোলজিস্ট। নিউ-ইয়র্কের স্যামসন ইনস্টিটিউটের মুখপত্রে তাঁর গবেষণার বিবরণ নিয়মিতভাবে ছাপা হয়। তাঁর ভারতী বিদ্যার গভীরতা পশ্চিমা পণ্ডিতেরা প্রথম জানতে পারেন সেই বিখ্যাত থীসিস থেকে—ঋগ্বেদের প্যান-থীইজ্‌মে কেলটীয় চারণসঙ্গীতের প্রভাব। এই দুরূহ সিদ্ধান্তকে প্রমাণে-অনুমানে প্রতিপন্ন করতে হলে যে-পরিমাণ সপ্রতিভ যোগ্যতা থাকা দরকার, টেনব্রুক সাহেবের সে সবই আছে। তিনি দেবনাগরী লিপি পড়তে পারেন, বাংলা লিখতে পারেন ও হিন্দীতে বক্তৃতা দিতে পারেন। তাঁর দাদু ক্যাপ্টেন টেনব্রুক ছিলেন বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্ক টোয়েনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভারতীয় কাল্‌চার সম্বন্ধে নানা নিগূঢ়

তথ্য তিনি দাদুর কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন। আজকাল ইণ্ডিয়াতে একটা জাতিবাদী অনুদারতার মালিন্য দেখা দিয়েছে, নইলে টেনব্রুকের প্রতিভার এই দিকটাও লোকে চোখে দেখতে পেত। জগদীশপুর থেকে বদলী হবার সময় বিদায়-সভায় বক্তৃতাক্রমে তিনি তাঁর মনের কথা অকপটে খুলে বলেছিলেন—আমার বুঝতে ভুল হতে পারে, হয়তো আমার জানার মধ্যে ভুল আছে, কিন্তু ইণ্ডিয়ার আত্মাটিকে আমি একরকম চিনেছি। চিরধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার মত ভারতের সেই আত্মাটিকে আমি ভালবাসি।

অনেকদিন আগে রাজগীরের মাঠে একটা পাথরের ধূপদান কুড়িয়ে পেয়েছিলেন টেনব্রুক। এই ধূপদানটা একটা লালচে বেলেপাথরের ফোটা পদ্মফুলের মত। স্টুডিয়োতে একটা লম্বা তেপায়া স্ট্যাণ্ডের ওপর ধূপদানটা বসানো থাকে। প্রতি সন্ধ্যায় বেয়ারা এসে ধূপদানের বুকে প্রায় আধমুঠো কালাগুরু পুড়তে দেয়। টেনব্রুক বলেন—এর মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রাচ্য সৌগন্ধ্যের যাদু লুকিয়ে আছে।

বিদ্যাপীঠের ছোট ছোট ছেলেরা ফুটবল খেলছিল। আচমকা একটা হুডখোলা টুরার সড়ক ছেড়ে একেবারে সশব্দে দৌড়ে মাঠের গায়ে লাগলো। দুষ্টু ছেলের মতই উৎসাহে চঞ্চল টেনব্রুক গাড়ি থেকে এক লাফে মাঠে নেমে পড়লেন। ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে লেগে গেলেন।

খেলার মাস্টার অনাদিবাবুর বুকে দুরু-দুরু শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য হুইসিল বাজানো ভুলে গেলেন। তবু বার বার ডেভিড হেয়ারের কথা স্মরণ করে কোনো মতে নিজেকে ধীরে ধীরে আশ্বস্ত করে আনলেন। আবার আগের মত খেলা জমে উঠলো।

কিন্তু করালীবাবুর ছেলেটা—ঐ বলাই হলো এক নম্বরের

বেয়াড়া। বল ছেড়ে দিয়ে যেভাবে পেছন থেকে সাহেবকে লেঙ্গি মারবার চেষ্টা করছে, ঘন ঘন ফাউল হেঁকেও ওকে তুরস্ত করা যাচ্ছে না। অনাদি মাস্টারের মনের শান্তি ক্ষণে ক্ষণে খুঁচিয়ে নষ্ট করছিল বলাই—হিতাহিত ভাবনা নেই ছেলেটার।

খেলার শেষে টেনব্রুক সাহেব কিন্তু সব ছেলেদের মধ্যে বেছে বেছে বলাইকেই পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে গেলেন। সাহেব চলে যাবার পর অনাদি মাস্টার তবু বলাইকে আর একবার ভাল করে ধমকাতে ছাড়লেন না—ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম গোঁয়ারের মত খেলবে না।

অনাদি মাস্টারের মন কেন জানি ভরসা পাচ্ছিল না।

টেনব্রুক সাহেবকে লোকে আরও ভাল করে চিনতে পারলো সেইদিন—দরবার দিবসের অনুষ্ঠানে। ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বার লাইব্রেরী ও তালুকদার সমিতির প্রত্যেকটি সভা, তাছাড়া যত কেরাণী বেনিয়া পাদরী, সকলেই টেনব্রুক সাহেবের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

টেনব্রুক সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন— আমি প্রত্যেকটি সরকারী কর্মচারীকে এবং বিশেষ করে পুলিশকে একটি সত্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেই সত্য হলো, তাঁরা যেন কখনো না মনে করেন যে তাঁরা জনসাধারণের ভাগ্যবিধাতা। তারা পাব্লিকের সেবক মাত্র। পুলিশ যেন সর্বদা মনে রাখে যে তারা মস্তিষ্ক নয়—তারা দুটি হাত মাত্র। তাদের কর্তব্য শুধু অর্ডার পালন করা। আজকের সুপ্রভাতে আমার মনে কেন জানি একটা আবছা আশঙ্কা থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে—ভারতের আকাশে অলক্ষ্যে কোথায়ও বোধ হয় এক টুকরো অবাঞ্ছিত বেদনার মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। বোধ

হয় একটা পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে। আমাদের এই ছোট সুখী সহরেও ঝড় দেখা দিতে পারে। সেই পরীক্ষায় পাব্লিক ও গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক যেন অনর্থক তিক্ত না হয়ে ওঠে। সেইজন্য আমি আগে থেকেই সবার আগে পুলিশকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে এই সতর্কবাণী শুনিয়ে দিতে চাই। পুলিশ যদি আইনের মাত্রা লঙ্ঘন করে, তবে সেটাও রাজদ্রোহ বলে গণ্য করতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হবে, তার শাস্তিও আছে।

বক্তৃতার সময় সকলেই একটা তীব্র কৌতূহল ও ঐতিহাসিক প্রতিশোধের তৃপ্তি নিয়ে ডি-এস-পি রায়বাহাদুর জানকী প্রসাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। পুলিশ-প্রধান জানকী প্রসাদের মুখে কিন্তু কোনো ভাববৈকল্য দেখা দেয় না। লড়াইয়ের ঘোড়ার মত তাঁর কপালের মোটা মোটা শিরাগুলি এক অবধারিত আশ্বাসে শান্ত গর্বে দপ্ দপ্ করছিল—যেমন নির্বিকার, তেমনি শান্ত আর তেমনি স্পষ্ট।

বিদ্যাপীঠের খেলার মাঠের মতই সেখপুরার জীবন হাসিখুশিতে চঞ্চল হয়েছিল। টেনব্রুক সাহেব রোজ না হোক, সপ্তাহে তিনটি দিন অন্তত খেলতে আসেন। অনাদি মাস্টার একটা আশঙ্কা থেকে রেহাই পেয়েছেন। বলাই আর টেনব্রুক সাহেব একই সাইডে খেলে। দু'জনের মধ্যে আর সংঘর্ষের কোনো অবকাশ নেই। ছেলেগুলি সত্যি সত্যি খেলার ব্যাপারে যেন টেনব্রুকের ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল। প্রতি বৈকালে ওরা সাগ্রহ প্রতীক্ষায় সাহেবের গাড়ির শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

তবু মেঘ দেখা দিল। সেখপুরা শহরকে সত্যিই যেন একটা ঝড়ের আবেগ চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। লোকাল বোর্ডের একুশ জন সদস্য ইস্তফা দিল। তিনটে দিন হরতাল হলো। রাজ-

গঞ্জ কোলিয়ারিতে শুরু হল ধর্মঘট। জৈন ধর্মশালার আঙ্গিনায় একটা জনসভাও হয়ে গেল। একটা হাজার-মানুষের শোভাযাত্রা স্বরাজ পতাকা নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে গেল।

মিস্টার টেনব্রুক অবিচল ছিলেন। একটিও লোক গ্রেপ্তার হলো না, একশো চুয়াল্লিশ জারি করে কোনো ঢোলের শব্দ বাজলো না। পুলিশ শুধু সেজেগুজে কোতোয়ালীতে বসে থাকে। বাইরে যাবার কোনো প্রয়োজন হয় না—টেনব্রুকের কড়া নির্দেশ।

সূর্যকুণ্ডের জলের মত সেখপুরা যেন তিনটি মাস ধরে উত্তেজনায় ফুটতে লাগলো। তাব মধ্যে মিস্টার টেনব্রুক শুধু একটি কাজ করলেন; দিকে দিকে ইস্তাহার ছড়িয়ে দিলেন—"আমার প্রিয় সেখপুরার পাব্লিকের কাছে এই আবেদন করতে চাই যে, যে কোনো বিবাদ বা প্রতিবাদ হোক—আলোচনা করে, তার নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছণীয়। সভ্যতাব চরম উন্নতি হলো ডেমোক্রেসী, ডেমোক্রেসীর প্রাণ হলো ডিসিপ্লিন। সেই ডিসিপ্লিন যেন নষ্ট না হয়।"

ঘটনাগুলি যেন নিজের উত্তেজনাতে অবসন্ন হয়ে ক্রমে থিতিয়ে এল। কোথাও প্রতিহত হলো না বলেই বোধ হয় ফুরিয়ে গেল। টেনব্রুক তাঁর নৈতিক এক্সপেরিমেন্টের এই অভাবিত সাফল্যে খুশিতে বিভোর হয়ে রইলেন। শহরের নানা সম্প্রদায়ের দশজন বেসরকারী এবং পাঁচজন সরকারী প্রধানকে ডেকে নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করলেন। কে যেন পরামর্শ দিল, ডি-এস-পিকে কমিটির মধ্যে গ্রহণ করা হোক। শুদ্ধাদর্শী টেনব্রুক শুচিবাতিকের মত নাক কুঁচকে আপত্তি জানালেন—না, কোনো মতেই নয়।

শুধু থামছে না প্রভাত ফেরীর গান। ঝড়টা যেন পালিয়ে গেছে শুধু ভৈরবী সুরের একটা আক্রোশ রেখে দিয়ে। সেখপুরার নিথর

সুপ্তির মধ্যে প্রতিদিন শেষ রাত্রে কারা যেন পথে পথে গান গেয়ে চলে যায়। টেনক্রুক দিন গুনছিলেন, এই চৌরচপলতাও ক্রমে শান্ত হয়ে আসবে।

অনেক দিন গোনা হয়ে গেল। টেনক্রুক তবু ধৈর্য ও বিশ্বাসে অটল ছিলেন। শান্তি কমিটি কত গোপন খবর এনে দিল, তবু প্রভাতফেরীর রহস্যটা আজও ঘুচলো না। কেউ বলতে পারে না, কারা গান গায়, কোথা থেকে আসে এবং কোথায় চলে যায়? মাঝ রাত্রে শহরের সব পাড়ার কত ছেলেবুড়ো উঠে বসে থাকে। প্রতীক্ষায় নিঝুম মুহূর্তগুলি পার হতে থাকে। হতাশ হয়ে ভাবে--আজ বুঝি আর গানটা এল না। সেই আনমনা অবকাশের মধ্যে চকিতে বাইরের পথে গানের শব্দ উতরোল হয়ে ওঠে। দরজা খুলে বাইরে আসতে আসতেই মিলিয়ে যায় কাউকে দেখা যায় না।

এ গান কখনও বন্ধ হবে না। শহরে একটা কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে—এই গয়ারোড ধরে যদি মাইল খানেক পশ্চিমে এগিয়ে যাও, তবে প্রথমে পড়বে ডুমরিচকের ডাকবাংলা। সেখান থেকে ডাইনে বেঁকে আরও পাঁচ ক্রোশ। পুরনো কারবালা পার হয়ে একটা বহেড়ার জঙ্গল, তার উত্তর ঘেঁষে একটা নদী। নদীর এক পাশে একটা প্রকাণ্ড পিপুল গাছ হেলে আছে। অন্য পাশে পি-ডব্ল্যু-ডির সড়ক।

—হ্যাঁ আছে। সবাই জানে, সার্ভিস বাসগুলি গিরিডির পথে মোড় ফেরবার আগে এইখানে একটু জিরিয়ে নেয়—রেডিয়েটারে নতুন জল ঢালে। একটা চৌকীদারী ফাঁড়ি আছে সেখানে। পিপুলতলার একটা গাঁথুনির ওপর দ্রাঘিমার নম্বর লেখা আছে।

শোকাবহ বেদনায় কাহিনীটা আরো করুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে—সেই সন সাতান্নের গদরে ঠিক ঐ জায়গাটিতে একশো জন ছত্রী

সেপাইয়ের প্রাণ গিয়েছিল। এক কার্ণাইল সাহেব ঐ পিপুলতলায় তোপ বসিয়ে বন্দী ছত্রীদের উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে কাহিনীটা সবার কানে কানে চুপি চুপি ফিস্‌ফিস্ করে যায়—গানটা সত্যিই কোনো মানুষের গলার গান নয়—প্রভাতফেরীটেরী নয়। একটা শব্দমরীচিকা মাত্র। গয়ারোডের দিক থেকেই শব্দটা প্রথমে শোনা যায়। সারারাত ধরে এগিয়ে আসে, তারপর শহরে ঢোকে এবং ভোর হতে না হতেই সরে পড়ে।

মিস্টার টেনক্রুকও কাহিনীটা শুনলেন। বিভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত শান্তি কমিটিকে তিনিই আশ্বাস দিয়ে জানালেন—ঘাবড়াবার কিছু নেই। এইসব প্রেতরাগিণী আর কিম্বদন্তীর সঙ্গে লড়বার কায়দাও আমি জানি।

অঘ্রানের রাত্রি ভোর হয়ে আসে। মোড়ের মাথায় মিউনিসিপাল ল্যাম্পপোস্টের মাথাটা তখনো জ্বলছে। শিশির-ভেজা সড়কটা নেতিয়ে পড়ে আছে অলসভাবে। শালের ডালপালাগুলি এক একটা কুয়াসার স্তবক আঁকড়ে নিঝুম হয়ে আছে। সেই ফিকে অন্ধকার আর মূক নিসর্গের মাঝখানে কাছারী রোডের ধারে একটি গাছতলায় মিস্টার টেনক্রুক যেন গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—এক অবাস্তব দেশের সেনাবারিকে সতর্ক শান্ত্রীর মত।

এতক্ষণে শুনতে পাওয়া গেল। মন্থর বাতাসের গায়ে দূরাগত সেই অদ্ভুত সুরের শিহর এসে লাগছে। গানের ভাষা স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। ছোট ছোট শব্দময় স্রোত একসঙ্গে মিশে গিয়ে যেন এক সুরপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। তারা এগিয়ে আসছে।

—নয়া জমানার সূর্য উঠেছে। জাগো আমার হিন্দুস্থানী ভাই আর বহিন। জেগে উঠে এই নতুন রশ্মি সাগ্রহে পান কর।

গাইতে গাইতে প্রভাতফেরীর দলটা সামনে এসে পড়লো। ছোট ছোট কতগুলি গীতপ্রাণ অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। চেনবার জো নেই। মিস্টার টেনব্রুক স্তব্ধ হয়ে নিশ্বাস রুখে শুনছিলেন। কতগুলি কচি কিশোর মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর—তার হর্ষ উল্লাস আক্ষেপের প্রত্যেকটি ধ্বনি তাঁর অতি পরিচিত। টেনব্রুকের চোয়াল দুটো রুদ্ধ উত্তেজনায় নিঃশব্দে কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন টেনব্রুক। পরিশ্রান্ত গানের সুরটা যেন এপাড়া-ওপাড়া ছুঁয়ে এলোপাথাড়ি দৌড়ে চলে যাচ্ছে। মাঠের কাছাকাছি গিয়ে গানটা আর একবার বিজয় প্রণাদের মত উদ্দাম হয়ে উঠলো। তারপরেই আকস্মিক একটা বিরাম। কিছুই শোনা যায় না। অনেকক্ষণ পরে আবার গুমরে উঠলো—একেবারে অন্যদিকে। বোধ হয় পশ্চিমের ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে রেললাইন ডিঙিয়ে দর্জিপাড়ার দিকে ছুটে চলেছে। চটুল ঘূর্ণি বাতাসের মত গানটা যেন উড়ে যাচ্ছে।

গল্প আছে, আওরঙজেব অক্ষয় বটের শেকড় তুলে ফেলে তাতে গরম সীসা ঢেলে দিয়েছিলেন যেন ভবিষ্যতে কোনো দিন আর চারা গজিয়ে না ওঠে। একেই বোধ হয় আমূল চিকিৎসা বলে।

টেনব্রুক বোধ হয় গল্পটা জানতেন। বিকালে বিদ্যাপীঠের ছুটির পর ছাত্রেরা কেউ বাড়ি যেতে পারে নি। স্বয়ং টেনব্রুক উপস্থিত থেকে ছাত্রদের একটা শোভাযাত্রা রওনা করিয়ে দিলেন। রাত দশটা পর্য্যন্ত শহরের সর্বত্র এই শোভাযাত্রা ঘুরবে। ফিরে বিদ্যাপীঠে এসেই শেষ হবে। তারপর খাওয়া দাওয়া হবে। টেনব্রুক জিলিপি কেনবার জন্য দশটি টাকা দিলেন।

প্রায় একশো ছাত্রের পুরোভাগে অগ্রনায়কের মত একটু এগিয়ে

দাঁড়িয়েছিল বলাই। তাকেই শোভাযাত্রা চালিয়ে আর গাইয়ে নিয়ে যাবার ভার দেওয়া হয়েছে। টেনব্রুক সাহেবের নির্দেশ।

বলাইয়ের মাথাটা সামনের দিকে ভাঙা গাছের ডালের মত ঝুঁকেছিল। মাটির দিকে একটা উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি নিয়ে দেখছিল বলাই। ওর সমস্ত দুরন্তপনা এক চরম অপমানের আঘাতে যেন অসাড় হয়ে গেছে। আসন্ন মূর্চ্ছার সময় রোগীকে যেন জোর করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

গানটা টেনব্রুকের রচনা। নামতা পড়াবার ভঙ্গীতে বলাই সুর করে গানের পদটি গাইলো—আমি যীশুর ছোট মেষ!

শোভাযাত্রী ছেলেরা বিষণ্ণ পাখির ঝাঁকের মত কিচির মিচির করে ধুয়া ধরে গাইলো আমি যীশুর ছোট মেষ।

যেন জিভে কামড় পড়েছে, বলাই হঠাৎ আরও জোরে বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ—

ছেলের দল প্রতিধ্বনি করলো—প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ।

শোভাযাত্রা রওনা হলো। হিতৈষী অভিভাবকের মত মনের স্নেহ মনেই গোপন রেখে, শাসনের দোর্দণ্ড বিগ্রহের ভঙ্গীতে যেন টেনব্রুক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন, বাংলোয় চলে গেলেন। তিনি জানতেন, রাত্রি দশটা পর্যন্ত এইভাবে সুপথে চলে ছেলেগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়বে—বিপথে যাবার উৎসাহও নিভে যাবে। তাছাড়া দশটাকার ঘুমপাড়ানী মিষ্টির ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। আর ভাবনা নেই। টেনব্রুক নিশ্চিন্ত হলেন।

সন্ধ্যে হয়েছে। ডিস্‌ট্রিক্ট গেজেটিয়ারখানা টেবিলের ওপর রাখা ছিল। ইণ্ডোলজিস্ট টেনব্রুক আজ সেখপুরার প্রত্নরহস্যের বুক চিরে খানাতল্লাসী করবেন। ঐ প্রতিহিংসাপরায়ণ কিম্বদন্তীটা

ভয়াবহ ব্যাধির মত সারা সেখপুরার নাগরিক বুদ্ধি বিষাক্ত করে তুলেছে। এর পেছনে কোনো সত্যের ভিত্তি আছে কি?

গেজেটিয়ার হাতড়ে হাতড়ে টেনক্রুক এক জায়গায় এসে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। সত্যিই যে লেখা আছে ছাপার অক্ষরে—ডুমরিচকের ডাকবাংলো থেকে এগার মাইল দূরে যে পিপুল গাছের তলায় স্থানীয় দ্রাঘিমারেখার পরিচয় লেখা আছে, সেখানে একদিন কোম্পানীব ফৌজের কামানের বেদী ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলে, মিউটিনির সময় ঐখানে সেপাই বন্দীদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কোন্ গবেট সার্ভেয়ার এই ষাঁড়-মোরগ গল্পটি সরকারী গ্রন্থের পাতায় ফেঁদে গেছেন! মিস্টার টেনক্রুক মনে মনে সেই মূঢ় পণ্ডিতের বুদ্ধিকে লিঞ্চ করলেন। ধিক্কার দিলেন- এইসব রন্ধ্র দিয়েই একদিন শনি ঢোকে এবং হয়েছেও তাই। জন কোম্পানীর বেনেবুদ্ধি দিয়ে বিংশ শতাব্দীর কলোনি শাসন চলে না। চাই আমূল চিকিৎসা। ইণ্ডোলজিস্ট টেনক্রুক তাঁর প্রতিভার ছুরিকে দু'ঘণ্টা ভেবে ভেবে শানিয়ে নিলেন।

নতুন করে প্যারা লিখলেন টেনক্রুক।—'ডুমরিচক ডাকবাংলা থেকে এগার মাইল দূরে, নর্দার ধারে, পিপুলগাছের তলায় যেখানে দ্রাঘিমারেখার পরিচয় লেখা রয়েছে, সেখানে (প্রথম পৌরাণিক যুগে—খৃষ্ট মৃত্যুর পরে পঞ্চম শতকে) ব্রহ্মদত্ত নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল···

হঠাৎ একবার কলম থামালেন টেনক্রুক। ভাবতে ভাবতে ভুরু দুটো কেঁচোর মত পাকিয়ে উঠলো। কদর্য একটা কুহক যেন ছোট ছায়ামূর্তি ধরে তাঁর দৃষ্টিপথ জুড়ে নেচে বেড়াচ্ছে। এই মূর্তিটাকে চিনতে পারা যায়—গান্ধী গান্ধী গান্ধী। সবাই তাকে বলে গান্ধী। কে এই গান্ধী? এই অশান্ত অবাধ্য দুষ্টু ফকীর গান্ধী? কী ভেবেছে সে?

দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত করে কলমটা আবার তুলে ধরলেন টেনব্রুক। যেন একটা প্রেরণার আবেশে লিখে ফেললেন—'এক দুর্দান্ত পাপী কিরাতের দৌরাত্ম্যে রাজ্যের সুখ ও শান্তি নষ্ট হতে বসেছিল। ক্ষত্রিয় রাজা দেবপ্রিয়ের সেবায় ও প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে ঋষি ব্রহ্মদত্ত সেই কিরাতকে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলেন।'

টাইপ রাইটার মেসিনটাকে সাগ্রহে বুকের কাছে টেনে নিলেন টেনব্রুক। নতুন একটি কাগজের স্লিপের ওপর এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে টাইপ করে সাজালেন। পুরনো প্যারাগ্রাফের ওপর থাপে থাপে মিলিয়ে আঠা দিয়ে সেঁটে দিলেন। চেপে চেপে বসিয়ে দিলেন, চার পাশ থেকে দেখলেন, যেন কোথাও কোনো ফাঁক না থাকে।

এই সামান্য কাজটুকু করতেই হাঁপিয়ে উঠেছিলেন টেনব্রুক। ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। একটা বাচাল ঝর্ণার মুখে যেন পাথর চাপা দিচ্ছেন। আশ্বস্ত হলেন, আর কোনো ফাঁক নেই।

বাকী রইল আজকের রাতটা। তখন সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। এক পেয়ালা কফি খেয়ে পরিশ্রান্ত টেনব্রুক ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ পাইচারী করে নিলেন। তারপর ল্যাম্পের ওপর নীলকাঁচের ঘেরাটোপ টেনে দিয়ে পড়তে বসলেন। সার্থক আনন্দের আরামে সোফার ওপর শরীর এলিয়ে দিলেন।

বাইরের শব্দহীন অন্ধকারটা তখন জমাট বেঁধে গেছে—একটা শোকাচ্ছন্ন রাত্রির হৃদ্‌পিণ্ডের মত। আমবাগানের ভেতর দিয়ে ছাত্রদের শোভাযাত্রা ফিরছে এতক্ষণে। একশত ক্লান্ত ভাঙা-গলার একটা বিকৃত গানের শব্দ আসছে। ঠিক শব্দ নয় শব্দের রুষ্ট নিঃশ্বাস। একটা আহত সর্পযূথ যেন বিষদাঁত নতুন করে ঘসে নেবার জন্য আড়াল দিয়ে সরে পড়ছে।

হঠাৎ শিউরে উঠলেন টেনব্রুক। ভারতের আত্মার ছবিটা টেনব্রুকের মনের ভেতর হঠাৎ ঘোলা হয়ে গেল—কাঞ্চনজঙ্ঘার চিরধবল চূড়ার মত নয়, বলাইয়ের মুখটার মত বর্ণচোরা হিংসুক ও ভীরু।

টেনব্রুক খোলা জানালার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। একটা নিষ্ঠুর নৈরাশ্য চিন্তার শিরায় শিরায় শিউরে উঠতে লাগলো—না, ওরা মানবে না। আবার ওরা আসবে। আজই রাত্রিশেষে—those singing ghouls—সেই বায়ুভূত নিরালম্ব ছোট ছোট মসীমূর্তি—শয়তানী আনন্দে অপমৃত্যুর কোরাস গাইতে গাইতে আবার আসবে—দল বেঁধে—কাতারে কাতারে।

রাজগীরের ধূপদানের বুকটা তখন প্রবলভাবে পুড়ে চলেছে। কুণ্ডলী কুণ্ডলী ধোঁয়া জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে অবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে বাইরে উড়ে যাচ্ছে। টেনব্রুকের মাথার ভেতর একটা বোবা বিভীষিকা ছটফট করতে লাগলো।

অসহ উদ্বেগে টেনব্রুক টেবিলের ওপর ঘন্টি ঠুকতে লাগলেন। বেয়ারাটা তন্দ্রা ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে ডাকলো—হুজুর!

টেনব্রুকের সারা মুখে একটা রক্তাভ জ্বালার দীপ্তি। মাত্রা ছাড়িয়ে অস্বাভাবিক রকম স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—জলদি দৌড়ে যাও, ডি-এস-পি সাহেবকে সেলাম দাও। সুবেদার মেজরকে বোলাও। জলদি কর। আজ রাত্রে ইষ্টার্ণ রাইফেলস্‌ ঘুমোতে পারবে না। সহরটাকে কর্ডন দিয়ে রাখ। সমস্ত রাত পাহারা দিতে হবে। শিকারীর মত তাড়া করে আজ ওদের ধরে ফেলতে হবে। চরম শিক্ষা শিখিয়ে দিতে হবে আজ।

ডেমোক্রেসীর এই সঙ্কটের শেষ ঘটনা হলো সম্রাট বনাম বলাইয়ের মোকদ্দমা। তার বিবরণ জানবার উপায় নেই। কে ঢুকবে আদালত এলাকায়। যে-ভয়ানক লাঠি আর লালপাগড়ীর আস্ফালন! বন্দীবাহী মোটর লরিটা থেকে নামবার সময় দূর থেকে বলাইকে চকিতে একটুখানি দেখতে পাওয়া যায় -মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া। ডি-এস-পি জানকী প্রসাদের মূর্তিটাই সব চেয়ে স্পষ্ট হযে চোখে পড়ে—আদালতের উঁচু বারান্দার ওপর টান হযে দাঁড়িযে বেল্টের ওপর হাত বোলান, কপালের ওপর টা মোটা শিরাগুলি অশান্ত গর্বে দপ্‌ দপ্‌ করে ফুলে ওঠে, আর ফটকের বাইরে ভিড়ের দিকে তাকিযে হঠাৎ গর্জন করে ওঠেন—ডিসপার্স।

তারপরেই ফটকের পুলিশ পিকেটের দিকে তাকিযে থাবা তুলে অর্ডার হাঁকেন—চার্জ।